হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

আ টেল অভ থ্রি লায়ন্স

রূপান্তর : কাজী মায়মুর হোসেন

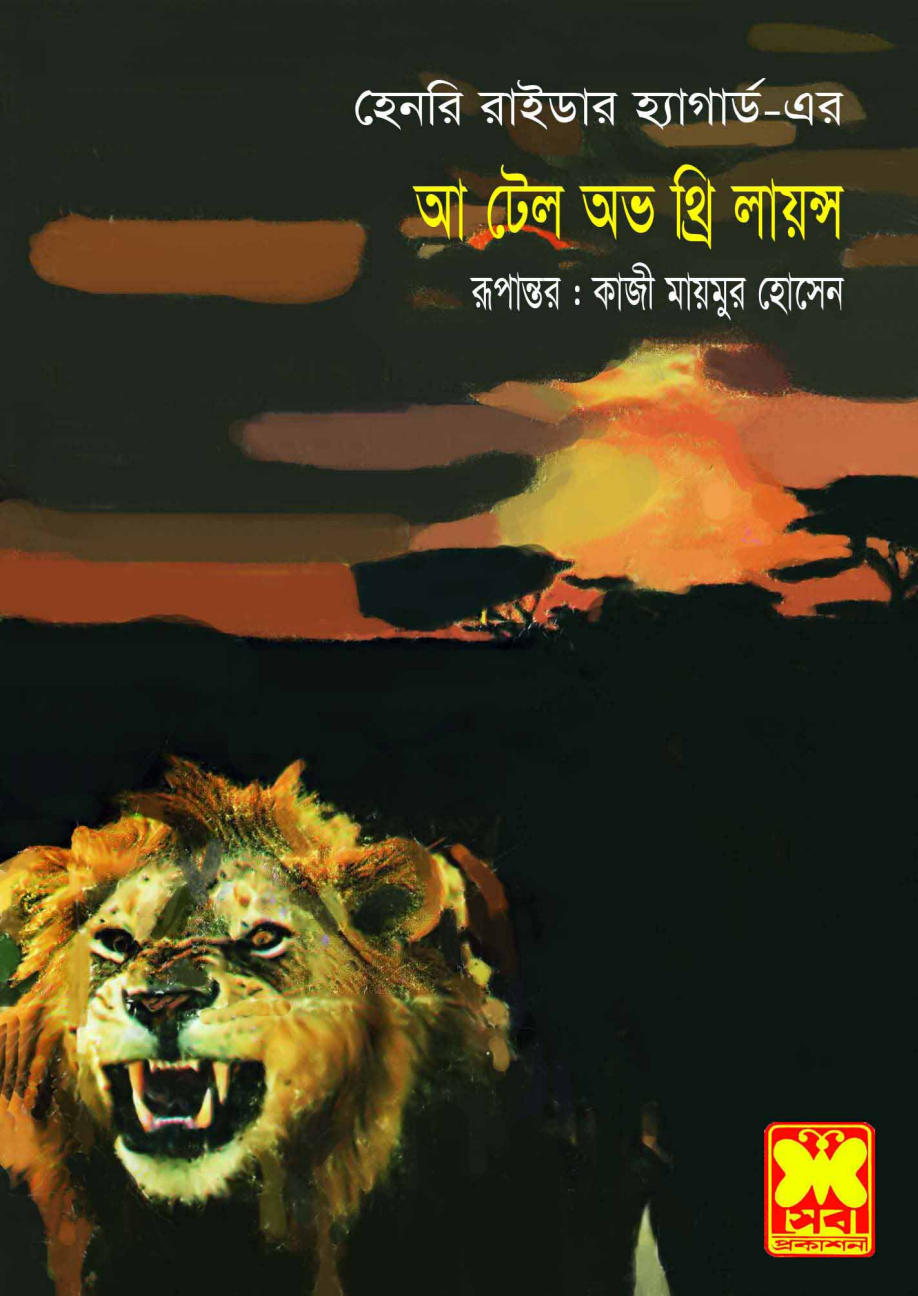

সেবা প্রকাশনী

হান্টার কোয়াটারমেইন

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড/ রূপান্তর: কাজী মায়মুর হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

পরিচিতরা সবাই জানেন, খুবই অতিথিবৎসল মানুষ স্যার হেনরি কার্টিস। এখন শিকারের যে-কাহিনি আমি বলতে যাচ্ছি, তা তাঁর ইয়র্কশায়ারের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে জেনেছি। যাঁরা এ-কাহিনি পড়বেন, তাঁদের অনেকেই নিঃসন্দেহে একটা গুজব শুনেছেন–স্যার কার্টিস আর তাঁর বন্ধু ক্যাপ্টেন গুড আফ্রিকার গহন-গভীর-বিপদসঙ্কুল এলাকায় অভিযানে গিয়ে প্রচুর হিরে পেয়েছেন। হিরেগুলো ছিল রাজা সলোমন অথবা তাঁরও আগের কোনও নৃপতির।

খবরটা পত্রিকায় পড়ে তার পরদিনই রওনা হয়ে গিয়েছিলাম ইয়র্কশায়ারে। ওখানে যখন পৌঁছলাম, ততক্ষণে কৌতূহলে হয়ে উঠেছি অধীর। হাজারো বছরের প্রাচীন গুপ্তধনের সংবাদ পেলে কেই-বা উত্তেজিত না হয়! স্যার কার্টিসের হল-এ পৌঁছবার পর দেরি না করে তাঁকে হিরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করলেন না তিনি। তবে খানিক চাপাচাপি করবার পরেও কিছু বললেন না। মুখ খুললেন না ক্যাপ্টেন গুডও, এড়িয়ে গেলেন। স্যার কার্টিসের বাড়িতে অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন তিনিও।

'আমার কথা বিশ্বাস করবেন না আপনি,' প্রাণখোলা হাসি হাসলেন স্যার কার্টিস। 'আমাদের শিকারী কোয়াটারমেইন আসুন, তার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে। আফ্রিকা থেকে আসবেন তিনি, আজ রাতেই পৌঁছুবেন। তিনি পৌঁছুনোর আগে গুড বা আমি মুখ খুলব না। সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন তিনি। ...আসলে, তিনি না থাকলে প্রাণে বেঁচে ওখান থেকে ফিরতেই পারতাম না আমরা। সময় হয়ে এসেছে, একটু পরেই তাঁর আসবার কথা।'

আর কিছু বলতে রাজি নন তিনি। আরও বেশ কয়েকজন অতিথি হাজির আছেন। কৌতূহল চেপে রাখতে হলো তাঁদেরও। মহিলাদের কয়েকজন তো রীতিমতো হাঁসফাঁস করছেন।

ডিনারের আগে যখন ক্যাপ্টেন গুড ড্রইং রুমে পঞ্চাশ ক্যারেটের বিরাট একটা আকাটা হিরে দেখালেন, তখন তাঁদের যা চেহারা হলো, তা জীবনেও ভুলতে পারব না। ক্যাপ্টেন গুড বললেন, এরচেয়ে অনেক বড় হিরেও আছে তাঁদের কাছে।

মহিলাদের চেহারায় একই সঙ্গে কৌতূহল আর ঈর্ষার ছাপ এতো প্রকট ভাবে আগে কখনও দেখিনি।

ঠিক তখনই ঘরের দরজা খুলে গেল। মিস্টার কোয়াটারমেইনের উপস্থিতি ঘোষণা করা হলো। হিরেটা পকেটে পুরে রাখলেন ক্যাপ্টেন গুড।

খানিকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ঢুকেছেন ছোটখাটো একজন লোক,

চেহারায় লজ্জার ছাপ। তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন ক্যাপ্টেন গুড। স্যার কার্টিস অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে। 'এই যে আমাদের শিকারী, গুড,' খুশি-খুশি গলায় বললেন তিনি, 'এসে গেছেন!' অতিথিদের দিকে হাসিমুখে তাকালেন। 'ভদ্রমহোদয়গণ, ভদ্রমহিলাগণ, আফ্রিকার সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও সেরা শিকারীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এঁর গুলি কখনও ফস্কায় না। শিকারী জীবনে ইনি আমাদের সবার চেয়ে বেশি হাতি-সিংহ মেরেছেন।'

স্যার কার্টিসের কথা শুনে মিস্টার কোয়াটারমেইনের দিকে আরও কৌতূহল নিয়ে তাকাল সবাই। আকারে মানুষটা বেশি বড় না হলেও কী একটা আকর্ষণ যেন আছে তাঁর মাঝে। ছোট-ছোট আগোছাল চুল, ব্রাশের মতো দাঁড়িয়ে। বাদামী চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হয় কিছুই এড়াচ্ছে না তাঁর নজর। রোদে-বৃষ্টিতে চেহারার রং হয়েছে মেহগনি কাঠের মতো বাদামী। অদ্ভুত ভঙ্গিতে কথা বলেন তিনি। সুরটা এমনই যে, মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ডিনারের সময় তাঁর পাশেই বসলাম। আলাপ জুড়তে চাইলাম, কিন্তু ব্যর্থ হলাম। অবশ্য জানালেন, কিছুদিন আগে স্যার হেনরি কার্টিস এবং ক্যাপ্টেন গুডের সঙ্গে আফ্রিকার গভীরে দীর্ঘ যাত্রায় গিয়েছিলেন, সেখানে গুপ্তধনের সন্ধান পান। প্রসঙ্গ বদলে ফেললেন তিনি, জিজ্ঞেস করলেন ইংল্যান্ডের কথা। অনেকদিন আগে এসেছিলেন তিনি ইংল্যান্ডে, তারপর আর আসা হয়নি। প্রসঙ্গটা আমাকে টানল না। আবার আমি আগের প্রসঙ্গে ফিরতে চাইলাম। ওক প্যানেল করা একটা ভেসটিবিউলে ডিনার সারছি আমরা। দেয়ালের হুকে ঝুলছে হাতির দুটো প্রকাণ্ড দাঁত। তার নীচে ঝুলছে বাফেলোর শিং। খুব রুক্ষ আর গিঁঠওয়ালা ওগুলো। বয়স্ক ষাঁড়ের শিং। শিঙের মাথাগুলো ভেঙে ফেটে গেছে। খেয়াল করলাম, ওগুলোর উপর ঘুরছে শিকারী কোয়াটারমেইনের চোখ। সুযোগ বুঝে জিজ্ঞাসা করলাম, ওগুলো সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কি না।

'জানি,' মৃদু হাসলেন তিনি। 'দাঁত দুটো যে-হাতিটার ছিল, সেটা আমার দলের একজনকে আঠারো মাস আগে দু'টুকরো করে ফেলেছিল। আর বাফেলোর শিং? বাফেলোটা আরেকটু হলে মেরে ফেলেছিল আমাকে। আমার ঘনিষ্ঠ একজন মানুষ তো মারাই গেছে। স্যার হেনরি নাটাল ছেড়ে চলে আসবার আগে ওগুলো তাঁকে দিয়েছি আমি গত কয়েক মাস আগে।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কোয়াটারমেইন। আরেক মহিলা পাশেই ডিনার করতে বসেছেন, তিনিও হিরের ব্যাপারে অত্যন্ত কৌতূহলী। সারা টেবিলেই একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। কাজের লোকরা চলে যাওয়ার পর ঝড় বইতে শুরু করল তাঁদের প্রশ্নের।

'মিস্টার কোয়াটারমেইন,' অনুযোগের সুরে বললেন পাশের মহিলা, 'ক্যাপ্টেন গুড আর স্যার কার্টিস আমাদের উদ্‌গ্রীব করে রেখেছেন, অনেকবার অনুরোধ করার পরও কিছুই প্রায় বলেননি গুপ্তধনের ব্যাপারে। বলেছেন, আপনি আসার পর জানাবেন। ...আর ধৈর্য ধরতে পারছি না, প্লিয, বলে ফেলুন এবার কী ঘটেছিল।'

'হ্যাঁ।'

'বলুন, প্লিজ।'

'বলুন না!'

সমঝদারের দৃষ্টিতে টেবিলের চারদিকে তাকালেন মিস্টার কোয়াটারমেইন, মনে হলো না মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে খুব আনন্দিত বোধ করছেন। 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন,' ধূসর চুলভরা মাথাটা নেড়ে শুরু করলেন তিনি, 'আপনাদের হতাশ করতে হচ্ছে। আমি সত্যিই দুঃখিত। বলার তেমন কিছু নেই। আসলে হয়েছে কী, স্যার কার্টিস আর ক্যাপ্টেন গুডের অনুরোধে ওই অভিযানে কী ঘটেছিল, কীভাবে আমরা রাজা সলোমনের খনির খোঁজ পেলাম, তা লিখেছি আমি। পরে আপনারা সবই জানবেন। এখন যদি মুখে বলি, তা হলে অনেক ভুলভাল থেকে যেতে পারে। আশা করি আমার বক্তব্য সমর্থন করবেন স্যার কার্টিস আর ক্যাপ্টেন গুড। আমার পেশায় অনেকেই মিথ্যে বলে। আমি তাদের দলে পড়তে চাই না।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন,' বললেন স্যার হেনরি। 'এই একই কারণে আমি আর গুডও মুখ বন্ধ রেখেছি। বেশিরভাগ অভিযাত্রীর মতো মিথ্যুক বলে গণ্য হতে চাই না।'

তাঁর কথা শুনে হতাশার একটা গুঞ্জন উঠল অভ্যাগতদের মধ্যে।

'আমার ধারণা আপনারা আমাদের আরও কৌতূহলী করে তুলতে চেষ্টা করছেন,' খানিকটা অভিযোগের সুরে বললেন মিস্টার কোয়াটারমেইনের পাশে বসা তরুণী।

আস্তে করে ধূসর চুলওয়ালা মাথাটা নাড়লেন মিস্টার কোয়াটারমেইন। 'বিশ্বাস করুন, যতই আমি জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই আর জঙ্গলীদের মাঝে সময় কাটিয়ে থাকি না কেন, আপনার মতো সুন্দরী কাউকে ধোঁকা দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।'

মেয়েটিকে দেখে মনে হলো মিস্টার কোয়াটারমেইনের মিষ্টি কথায় খুশি হয়েছে।

আমি বলে উঠলাম, 'ঠিক আছে, মিস্টার কোয়াটারমেইন, আপনি না হয় গুপ্তধনের কথা না-ই বললেন, কিন্তু ওই হাতির দাঁত আর বাফেলোর শিঙের কাহিনি তো বলতে পারেন? এর কমে আপনাকে ছাড়ছি না।'

'সত্যি, গল্প একদম বলতে পারি না আমি,' বললেন মিস্টার কোয়াটারমেইন। 'তবে যদি আপনারা আমার অপারগতাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন, তা হলে বাফেলোর শিঙের কাহিনিটা খুশিমনে বলতে পারি। ওগুলোর বয়স এখন দশ বছর।'

'ব্রাভো, কোয়াটারমেইন,' হাসিমুখে বললেন স্যার হেনরি কার্টিস, 'কী ঘটেছিল তা বললে খুবই খুশি হবো আমরা। শুরু করে দিন। ...তার আগে, গ্লাসটা ভরে নিন।'

গ্লাসে ক্ল্যারেট ঢেলে ছোট্ট করে চুমুক দিলেন মিস্টার কোয়াটারমেইন, তারপর শুরু করলেন, 'দশ বছর আগে আফ্রিকার গভীরে গাটগারা নামের একটা জায়গায় শিকার করছিলাম আমি। জায়গাটা চোবে নদীর কাছেই। আমার সঙ্গে

ছিল চারজন আদিবাসী কাজের লোক, ম্যাটাবেলেল্যান্ডের ভূরলূপার বা নেতা, ড্রাইভার আর হটেনটট গোত্রের মানুষ হ্যান্স। এক জুলু শিকারীর দাস ছিল ও। আমাদের সঙ্গে আরও ছিল শিকারী মাগুন। পাঁচ বছর ধরে শিকার করেছে ও আমার সঙ্গে।

'গাটগারার কাছে চমৎকার একটা পার্কমত জায়গায় ক্যাম্প করলাম আমরা। বছরের সেই সময় অনুযায়ী ভাল ঘাস ছিল ওখানে। ওটাই হলো আমাদের হেডকোয়ার্টার। ঠিক করলাম, ওখান থেকেই চারপাশে শিকারের খোঁজ করব। আমার লক্ষ্য ছিল হাতির দল। কিন্তু কপালটা খারাপ যাচ্ছিল। সামান্য আইভরিই পেলাম। সে-কারণেই, যখন কয়েকজন আদিবাসী খবর নিয়ে এলো যে, বড় একটা হাতির পাল তিরিশ মাইল দূরে উপত্যকায় এসেছে, খুশি হয়ে উঠলাম আমি।

'প্রথমে ভেবেছিলাম, সরাসরি উপত্যকায় আস্তানা গাড়ব ওয়্যাগন নিয়ে, কিন্তু ভাবনাটা বাদ দিলাম ওখানে সেৎসি মাছির ঝাঁক আছে শুনে। ওই বিষাক্ত মাছির কামড়ে মানুষ, গাধা আর বুনো জন্তু-জানোয়ার ছাড়া আর সবকিছুরই মৃত্যু হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঠিক করলাম, ম্যাটাবেল নেতা আর ড্রাইভারের দায়িত্বে ওয়্যাগন রেখে হটেনটট হ্যান্স আর জুলু শিকারী মাগুনকে নিয়ে ঝোপের অঞ্চলে যাব।

'পরদিন সকালে রওনা হলাম আমরা। তার পরেরদিন পৌঁছলাম হাতিদের যেখানে দেখা গেছে বলে খবর পেয়েছি, সেখানে। কিন্তু এখানেও ভাগ্য ভাল হলো না আমাদের। হাতি ওখানে ছিল, তার চিহ্ন দেখতে পেলাম। প্রচুর নাদা পড়ে ছিল, এ ছাড়া মিমোসা গাছ উপড়ে ফেলা হয়েছিল, আরও ছিল উপড়ানো টপসি-টারভি। ওগুলোর মিষ্টি শেকড়ের জন্য উপড়ে নিয়ে খায় হাতি। তবে হাতির দেখা পেলাম না। অন্য কোথাও চলে গেছে হাতির দল। তখন একটা কাজই করার থাকল, সেটা হল ওগুলোর পিছু নেয়া। তা-ই করলাম। শিকার ভাল হলো না।

'পরের দু'সপ্তাহ বা তার কিছু বেশি সময়ে দু'বার হাতির পালের দেখা পেলাম। বিরাট বড় একটা দল। কিন্তু আবারও আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল ওগুলো। ক'দিন পর তৃতীয়বারের মতো হাতির পাল দেখলাম আবার। একটা মর্দাকে গুলি করতে পারলাম মাত্র। বাকিগুলো রওনা হয়ে গেল আবার। এবার গতি বেশি, সহজে থামবে না কোথাও। অনুসরণ করা অর্থহীন বুঝে সে-চেষ্টা আর করলাম না।

'ফিরতি পথ ধরলাম। সঙ্গে মাত্র হাতির একজোড়া দাঁত। মনটা ভাল নেই। পাঁচদিন পর ঢালের ওপারে যেখানে ওয়্যাগন রাখা হয়েছিল, সেখানে গাছের সারির কাছে পৌঁছুলাম। সভ্য মানুষের কাছে তার বাড়ি যেমন, তেমনি শিকারির কাছে তার ওয়্যাগন, কাজেই বাড়ি ফেরার একটা ভাল লাগার অনুভূতি নিয়ে এগোলাম। ঢালের ওপরে উঠে ওয়্যাগনের সাদা তাঁবু যেখানে থাকার কথা, সেদিকে তাকালাম। কোনও ওয়্যাগন নেই ওখানে। শুধু যতোদূর চোখ যায় কালো একটা পোড়া দাগ। চোখ কচলে আবারও তাকালাম। ক্যাম্পের জায়গাটা

দেখলাম। কিন্তু ওয়্যাগনটা নেই। পড়ে আছে কয়েকটা পোড়া কাঠ। হ্যান্স আর মাগুনকে নিয়ে ছুটে গেলাম ওখানে। মনটা একই সঙ্গে দুঃখ আর অনিশ্চয়তার দোলায় দুলছে। ঢাল বেয়ে দৌড়ে নেমে যে ঝর্নার ধারে ক্যাম্প ছিল, সেখানে চলে এলাম। বুঝতে পারলাম, আমার সন্দেহই সত্যি হয়েছে, ঘাসে ধরে যাওয়া আগুনে ওয়্যাগন, ওটার ভেতরের সমস্ত কিছু, বাড়তি গুলি আর অস্ত্র হারিয়েছি।

'যাওয়ার আগে ড্রাইভারকে বলে গিয়েছিলাম ক্যাম্পের চারপাশের ঘাস যাতে নিয়ন্ত্রিত ভাবে পুড়িয়ে রাখে, নইলে এধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নির্দ্বিধায় স্বীকার করি, যা ঘটেছে সেটা আমারই বোকামির শাস্তি। যদি আদিবাসীদের দিয়ে কেউ কোনও কাজ করাতে চায়, তা হলে সেটা তার নিজেরই তদারকি করা উচিত। বুঝতে পারলাম, আলসে শয়তানটা ওয়্যাগনের চারপাশের ঘাস পোড়ায়নি। বোধহয় অসতর্কতায় লম্বা লম্বা ট্যাম্বাউকি ঘাসে আগুন ধরিয়ে বসেছে নিজেরাই। সেই আগুন বাতাসের তাড়া খেয়ে ওয়্যাগনের তাঁবুতে এসে ধরেছে। ওয়্যাগন পুড়তে সময় নেয়নি এই শুকনো খটখটে আবহাওয়ায়। ড্রাইভার আর দলনেতার কপালে কী ঘটেছে জানি না। সম্ভবত ভীষণ রাগ করব টের পেয়ে ভেগেছে ষাঁড়গুলো নিয়ে। আজও পর্যন্ত তাদের দেখা পাইনি আমি আর।

'হতাশ হয়ে ঝর্নার ধারে বসে পোড়া অ্যাক্সেল, ওয়্যাগনের ঝলসানো খোলসের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বলতে দ্বিধা নেই, সেই মুহূর্তে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল আমার। মাগুন জুলু ভাষায় আর হ্যান্স ডাচ ভাষায় মুখ ছুটিয়ে গালাগাল দিচ্ছিল। আমাদের অবস্থা তখন সত্যিই করুণ। খামার অঞ্চল ম্যামাংওয়াটো থেকে তিনশো মাইল দূরে আছি আমরা। সাহায্য পেতে হলে ওটাই সবচেয়ে কাছের শহর। এদিকে আমাদের বাড়তি অস্ত্র, গুলি, কাপড়চোপড়, খাবার এবং আর সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে! আমার সঙ্গে পরনের ফ্ল্যানেলের শার্ট, চামড়ার জুতো, আট বোরের রাইফেল আর কয়েকটা গুলি ছাড়া আর কিছুই নেই। হ্যান্স আর মাগুনের কাছেও একটা করে মার্টিনি রাইফেল আর সামান্য গুলি আছে মাত্র। এই নিয়ে জনবিরল একটা রুক্ষ, বুনো এলাকার ভেতর দিয়ে তিনশো মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদের। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, জীবনে এমন বিপদে কমই পড়েছি।

'যা-ই হোক, এসবই শিকারী জীবনের স্বাভাবিক দুর্ঘটনা। কখনও কখনও অবস্থা বুঝে সেই অনুযায়ী চলা ছাড়া করার কিছু থাকে না আর।

'পোড়া ওয়্যাগনের ধারে রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে পরদিন সকালে সভ্যতার উদ্দেশে রওনা দিলাম আমাদের দীর্ঘ যাত্রায়। পথে যা-যা ঘটল তা যদি পুরোটা বলতে যাই, তা হলে মাঝরাতের আগে কথা শেষ হবে না, কাজেই আপনাদের অনুমতি সাপেক্ষে শুধু বলব ওই মোষের শিঙের কাহিনি।

'তখন একমাস হতে চলল আমরা পথ চলছি। এক বিকেলে, ম্যামাংওয়াটো থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ক্যাম্প করলাম আমরা। ততদিনে অর্ধাহার, অনাহার, নিঃসঙ্গতা আর পায়ের ব্যথায় ধসে গেছি তিনজন। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার

মতো আমাকে ধরেছে কড়া জ্বর। চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পাই না। শিশুদের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমাদের গুলিও প্রায় শেষ। আমার আট বোরের রাইফেলে তখন আর মাত্র একটা গুলি আছে। হ্যান্স আর মাশুনের মার্টিনি হেনরি দুটোর জন্যে তিনটে গুলি।

'সময়টা সূর্যাস্তের একঘণ্টা আগে হবে, থেমে আগুন জ্বাললাম আমরা। তখনও কয়েকটা ম্যাচ ছিল সৌভাগ্যক্রমে। জায়গাটা ছিল ক্যাম্প করার জন্যে সুন্দর। গেম-ট্রেইল ধরে চলছিলাম আমরা, পাশেই ছিল মিমোসা গাছভরা একটা খাদ। খাদের ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল পরিষ্কার পানির ঝর্না। এক জায়গায় ছোট একটা পুকুর সৃষ্টি করেছে ওটা। জায়গাটায় ওয়াটারক্রেসের অভাব ছিল না। ঠিক আমাদের টেবিলে যেমনটা দেয়া হলো, তেমনি জিনিস। কোনও খাবার ছিল না আমাদের কাছে। আমার দু'দিন আগে শিকার করা ছোট ওরিব অ্যান্টিলোপটার মাংস ফুরিয়ে গিয়েছিল সকালেই।

হ্যান্স-এর ধারণা, মাশুনের চেয়ে লক্ষ্যভেদে ও বেশি পারদর্শী। কাজেই মার্টিনির তিনটে গুলির দুটো সঙ্গে নিয়ে সে-রাতে মাংস জোগাড়ের জন্যে হরিণ শিকার করতে গেল ও। দুর্বলতার কারণে যেতে পারলাম না আমি।

'এদিকে মিমোসা গাছের শুকনো ডাল কেটে রাতের মতো একটা আশ্রয় বানাতে ব্যস্ত হলো মাশুন, জায়গা বেছে নিল পুকুরটা থেকে চল্লিশ গজ দূরে। দীর্ঘ যাত্রায় বারবার আমরা সিংহদের কারণে ঝামেলার শিকার হয়েছি। গতরাতে আরেকটু হলেই দলবেঁধে আক্রমণ করে বসত ওগুলো। ব্যাপারটা ওই দুর্বল শারীরিক অবস্থায় বিচলিত করে তুলেছিল আমাকে। কুঁড়েঘরটা তৈরি হয়ে যেতেই মাশুন আর আমি একটা গুলির আওয়াজ পেলাম। মনে হলো আওয়াজটা এলো একমাইল দূর থেকে। খুশি হয়ে বকবক শুরু করল মাশুন। মাথা ধরে গেল। একসময় বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলাম ওকে।

'গুলির আওয়াজটা শোনার খানিক পরে দিগন্তের আড়ালে মুখ লুকাল লালচে সূর্য, আফ্রিকার জঙ্গলের থমথমে নীরবতা নামল আমাদের ঘিরে। সিংহেরা তখনও বেরোয়নি। সম্ভবত চাঁদের জন্যে অপেক্ষা করবে। পাখি আর অন্যান্য জানোয়ার বিশ্রাম নিচ্ছে। রাতের সেই নীরবতা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। ওই দুর্বল শারীরিক অবস্থায় মনে হলো, প্রকৃতি কোনও দুঃখময় পরিস্থিতির কারণে থমকে গেছে। মনে হলো, হটেনটট হ্যান্স আর ফিরে আসবে না। মাশুনকে আমি একসময় বললাম, "মাশুন, পরিবেশটা বড় বেশি নীরব–মৃত্যুর মতো নীরব। হ্যান্স কোথায়? ওর জন্যে মনটা যেন কেমন করছে।"

'মাশুন বলল, "না, বাবা, আমি জানি না কী ঘটেছে, তবে ও হয়তো ক্লান্ত, ঘুমিয়ে পড়েছে। অথবা পথও হারিয়ে থাকতে পারে।"

'"কী বলছ, মাশুন," বিরক্ত হয়ে বললাম, "এতবছর তুমি আমার সঙ্গে শিকার করছ, কখনও দেখেছ কোনও হটেনটটকে পথ হারাতে, বা ফেরার পথে ঘুমিয়ে পড়তে?"

'"না, মাকুমাযান," স্বীকার করল মাশুন। "আমি জানি না ও কোথায়।"

'নানা কথাই বললাম আমরা, কিন্তু দু'জনের কেউই উচ্চারণ করলাম না আমাদের মন যা আশঙ্কা করছে। মন বলছিল, দুর্ভাগা হটেনটট আর কখনোই ফিরবে না।

"'মাশুন," খানিক পর বললাম, "যাও, পুকুরের ধার থেকে সবুজ লতা নিয়ে এসো। খিদে লেগেছে, কিছু খেতে হবে।"

"'না, বাবা," মাথা নাড়ল মাশুন। "ওখানে ভূত আছে। ভূতরা রাতে পাড়ে উঠে এসে শরীর শুকায়। গোপন কথাটা এক ডাইনী-ধরা বলেছে আমাকে।"

'আমার দিনের বেলায় দেখা অন্যতম সাহসী একজন মানুষ মাশুন, কিন্তু রাতে সভ্য মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও। "তা হলে কি আমাকেই যেতে হবে, বোকা?" জিজ্ঞেস করলাম।

"'না, মাকুমাযান," বলল মাশুন। "আপনার অন্তর যদি অসুস্থ মেয়েমানুষের মতো অদ্ভুত জিনিস চায়, তা হলে আমিই যাব। যদিও ভূত আমাকে খেয়ে ফেলতে পারে।"

"'তোমার খিদে পায়নি?" জিজ্ঞেস করলাম দুঃসাহসী মাশুনকে।

'গেল ও, একটু পরে ফিরল দু'হাত বোঝাই ওয়াটারক্রেস নিয়ে। খেতে শুরু করলাম। জিজ্ঞেস করলাম ওকে, "খিদে লাগেনি?"

'আমার পাশে বসে দেখছে মাশুন। বলল, "জীবনে কখনও এতো খিদে পায়নি।"

"'তা হলে খাও, ওয়াটারক্রেস দেখালাম।

"'না, মাকুমাযান, ওই লতাপাতা আমি খেতে পারব না," জানাল মাশুন।

"'না খেলে খিদেয় কষ্ট পাবে," জোর করলাম। "খাও, মাশুন।"

'চোখে সন্দেহ নিয়ে ওয়াটারক্রেসের দিকে খানিক তাকিয়ে থাকল মাশুন, তারপর একমুঠো নিয়ে মুখে পুরল। চিবাতে চিবাতে বলল, "ওহ্, কেন আমি মানুষ হয়ে জন্ম নিলাম, যদি ষাঁড়ের মতো এভাবে সবুজ লতাই খেতে হবে? আমার মা যদি জানত এমনটা ঘটবে, তা হলে নিশ্চয়ই বাচ্চা বয়সেই আমাকে মেরে ফেলত।" এসব বকবক করতে করতে খেয়ে চলল মাশুন, থামল সবগুলো শেষ করে। শেষে বলল, তার পেট ভরেছে, কিন্তু লতাগুলো তার পেটে ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে আছে। "পাহাড়ের ওপরের বরফের মতো।"

'জুলুরা সবুজ তরকারী পছন্দ করে না। অন্যসময় হলে হাসতাম, কিন্তু মাশুনের খাওয়া শেষ হতেই সিংহের জোরাল উফ্-উফ্ ডাক শুনতে পেলাম। আমাদের কুঁড়ের বিপজ্জনক রকম কাছে চলে এসেছে জানোয়ারটা। বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে বড় বড় হলুদ চোখ দেখতে পেলাম ওটার, শুনতে পেলাম নাক-ঝাড়া আর শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ। জোরে জোরে চিৎকার শুরু করলাম আমরা। আগুনের ভেতর আরও কয়েকটা ডাল ফেলল মাশুন। কাজ হলো তাতে। সিংহটাকে আর দেখা গেল না।

'সিংহ বিদায় নেয়ার পর আকাশে রুপোলি আলোর ছটা নিয়ে উঠল গোল একটা চাঁদ। ওরকম সুন্দর চাঁদনী রাত দেখা যায় না সহজে। জ্যোৎস্নার আলোয় কুঁড়ের ভেতরে বসে পকেটবুকের পেন্সিলে লেখা নোট পড়তে

পারছিলাম।

'চাঁদ উঠতেই পানি খাওয়ার জন্যে পুকুরে আসতে শুরু করল জন্তু-জানোয়ারের দল। ডানদিকের একটা টিলার গা ঘেঁষা বুনো পথে দেখতে পেলাম নানা জাতের প্রাণী, পানি খেতে চলেছে। আমাদের কুঁড়ের বিশ গজের মধ্যে চলে এলো বড় একটা ইল্যান্ড হরিণ। থেমে সন্দেহের দৃষ্টিতে কুঁড়েটা দেখল ওটা। আকাশের পটভূমিতে পরিষ্কার দেখতে পেলাম ওটার বিরাট শিংজোড়া। ইচ্ছে করছিল হরিণটাকে মেরে মাংসের চাহিদা মেটাই, কিন্তু মনে পড়ে গেল: আমাদের কাছে মাত্র দুটো গুলি আছে। চাঁদের আলোয় নিশ্চিত হয়ে গুলি করা সম্ভব হবে না। বাধ্য হয়েই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম শিকারের চিন্তা। পানির দিকে চলে গেল ইল্যান্ড। দু'এক মিনিট পরে ঝপাস-ঝপাস আওয়াজ হলো পানিতে। তারপরই ছুটন্ত খুরের খটাখট। "কী হলো, মাগুন?" জিজ্ঞেস করলাম।

মাগুন ওর কাঁচা ইংরেজিতে বলল, "ওই অভিশপ্ত সিংহ। ওটার গন্ধ পেয়েছে হরিণটা।"

'ওর কথা মাত্র শেষ হয়েছে, এমন সময় পুকুরের দিক থেকে তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে কাশির মতো শব্দ করে তার জবাব। "সর্বনাশ," চমকে বললাম, "দুটো সিংহ আছে। হরিণটাকে ধরতে পারেনি। সাবধান থাকতে হবে আমাদের।"

'আবার চিৎকার শুরু করলাম দু'জন, আগুনে আরও খড়ি ফেলা হলো। দূরে সরে গেল সিংহরা।

'মাগুনকে বললাম, "মাগুন, ওই গাছের মাথায় যখন চাঁদটা যাবে, তখন মাঝরাত হবে। সে-পর্যন্ত পাহারায় থাকো তুমি। আমাকে ডাক দেবে মাঝরাত হলে। সাবধানে পাহারা দিয়ো, নইলে তোমার হাড় ছেঁচড়ে নিয়ে যাবে সিংহ। আমাকে খানিক বিশ্রাম নিতেই হবে, নইলে মনে হচ্ছে বাঁচব না।"

'"কূস!" বলল মাগুন। "ঘুমান, বাবা। শান্তিতে ঘুমান। নক্ষত্রের মতোই দু'চোখ খোলা থাকবে আমার। আপনার ওপর আমার চোখ থাকবে।"

'যদিও খুব দুর্বল বোধ করছিলাম, তবু সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তে পারলাম না। জ্বরের কারণে মাথা-ব্যথা করছিল। মাথা থেকে দূর করতে পারছিলাম না হটেনটট হ্যান্সের চিন্তাও। নিজেদের ভাগ্যের অনিশ্চয়তার কথাও ভাবছিলাম। ফোস্কা পড়া পায়ে হাঁটতে হবে, পেটে দানাপানি পড়ছে না, সঙ্গে আছে শুধু দুটো কার্ট্রিজ—এদিকে জানি, অন্ধকারে ধারেকাছেই আছে একাধিক ক্ষুধার্ত সিংহ। এরকম পরিবেশে যে যতো অভ্যস্তই হোক, প্রাণের আশঙ্কা একজনকে জাগিয়ে রাখতে যথেষ্ট।

'তবে দুঃস্বপ্ন ভরা ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুমে তলিয়ে গেলাম অবশেষে। একসময় ঘুমের ঘোরে দেখলাম, লেজের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়ানো একটা গোক্ষুর হিসহিস করে আমাকে ডাকছে। "মাকুমাযান, নানযিয়া! নানযিয়া!" (ওখানে! ওখানে!)

'তন্দ্রার মাঝে মাগুনের গলার আওয়াজ চিনতে পারলাম। চোখ খুলে

দেখলাম, আমার পাশে উবু হয়ে বসে আছে মাগুন, আঙুল তাক করে পানির দিকটা দেখাচ্ছে। যতো পুরোনো শিকারীই হই, যে-দৃশ্য আমার চোখে পড়ল, তাতে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। আমাদের কুঁড়ে থেকে বিশ পা দূরে একটা পিঁপড়ের ঢিবি আছে। ওটার ওপর চার পা রেখে দাঁড়িয়েছে বিরাট এক সিংহী। কুঁড়ের দিকে চেয়ে রয়েছে ওটা। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম, মাথা নিচু করে পায়ের থাবা চাটল।

'আমার হাতে মার্টিনিটা ধরিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে জানাল মাগুন, গুলিভরা আছে ওটায়। রাইফেলটা কাঁধে তুললাম, তারপর ওই উজ্জ্বল আলোতেও দেখলাম মার্টিনির ফোরসাইট দেখতে পাচ্ছি না। এ অবস্থায় গুলি করা স্রেফ পাগলামি। গুলি যদি লাগেই, তা হলে সিংহীটা হয়তো না মরে আহত হবে। পরিণতি: ক্ষ্যাপা জানোয়ারের আক্রমণে মৃত্যু। কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেললাম রাইফেলটা। পকেটবুক থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে ওটা আটকালাম সামনের সাইটে। কাগজটা ঠিকমত আটকানোর আগেই আবার আমার বাহু খামচে ধরল মাগুন, কুঁড়ে থেকে দশফুট দূরের একটা মিমোসা গাছের নীচে দেখাল।

"'কী?" জিজ্ঞেস করলাম। "আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

"'আরেকটা সিংহ," বলল মাগুন।

"'অসম্ভব," প্রতিবাদের সুরে বললাম। "তুমি এতো ভয় পেয়েছ যে একটাকেই দুটো দেখছ।" বেড়ার উপর দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা আকৃতিটার দিকে তাকালাম।

'কথা শেষও হয়নি, উঠে চাঁদের আলোয় দাঁড়াল ওটা। কালো কেশরের বিরাট একটা চমৎকার সিংহ। এতবড় আমি খুব কমই দেখেছি। দু'তিন পা গিয়ে আমাকে দেখে থামল ওটা। সরাসরি আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। সিংহটা এতো কাছে যে আগুনের প্রতিফলন দেখতে পেলাম ওটার সবুজ চোখে।

"'গুলি করুন! গুলি করুন!" ফিসফিস করল মাগুন। "এখনই তেড়ে আসবে ওটা!"

'আবার রাইফেল তুললাম। কাগজটা সাইটে বসানোই আছে। তাক করলাম সাদা রোমশ একটা অংশে। ওখানটায় সিংহের বুক আর কাঁধের সংযোগ। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল সিংহটা। আমার অভিজ্ঞতা বলে, সিংহ তার শিকারের দৌড় শুরু করার আগে এভাবে একবার পেছনে তাকিয়ে নেয় সবসময়। ...তারপর শরীর নিচু করল ওটা। থাবাগুলো মাটিতে বসে গেছে দেখলাম, ছুটতে প্রস্তুত হচ্ছে সিংহ। মার্টিনির ট্রিগার টিপে দিলাম। আর দেরি করলে সর্বনাশ হতো, কারণ, মাত্র দৌড়ে আসতে শুরু করেছিল ওটা। রাতের থমথমে নীরবতা চিরে দিল মার্টিনি রাইফেলের তীক্ষ্ণ হুঙ্কার। আমাদের চারফুট দূরে লাফিয়ে এসে পড়ল বিরাট সিংহটা। গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে এলো আরও কাছে, থাবার আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিল ডালের তৈরি কুটিরের বেড়া। কুঁড়ের আরেকপাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। এটা ওটার ওপর দিয়ে গড়িয়ে আগুনের ওপর গিয়ে পড়ল সিংহ। ওখান থেকে উঠে সামনের দু'পায়ে ভর দিয়ে বিরাট একটা কুকুরের মতো বসল। এবার হুঙ্কার ছাড়তে শুরু করল ওটা। সে

যে কী ভয়ঙ্কর গর্জন তা না শুনলে কল্পনা করা যায় না। আগে কখনও সিংহকে এতো প্রচণ্ড গর্জন করতে শুনিনি। ফুসফুস ভরে শ্বাস টানছে ওটা, তারপর মুখ দিয়ে পিলে চমকানো হাঁক ছাড়ছে। একটা গর্জনের মাঝপথে হঠাৎ থেমে গেল বনের রাজা, একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেল, নড়ল না আর। বুঝলাম, মারা গেছে। সাধারণত মারা যাওয়ার আগে কাত হয় সিংহ।

'স্বস্তির শ্বাস ফেলে পিঁপড়ের ঢিবির ওপর দাঁড়ানো ওটার সঙ্গিনীর দিকে তাকালাম। বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে লেজ নাড়ছে এপাশ-ওপাশ। সিংহটার গর্জন থেমে যাবার পর আমাদের স্বস্তির সাগরে ভাসিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সিংহী, তারপর বিরাট এক লাফে অদৃশ্য হলো রাতের আঁধারে।

'সাবধানে মৃত সিংহের দিকে এগিয়ে গেলাম দু'জন। যেতে যেতে একটা গান ধরল মাশুন। সে-গানে বর্ণিত হলো কীভাবে মাকুমাযান, শিকারীদের শিকারী–যার চোখ দিনের মতোই রাতেও খোলা থাকে–আক্রমণোদ্যত সিংহের পেটে হাত দিয়ে শেকড় থেকে উপড়ে এনেছেন হৃৎপিণ্ড। থামতে চায় না সে-গান।

'যেখানে তাক করেছিলাম, সেই সাদা জায়গাটার এক ইঞ্চির মধ্যেই লেগেছে বুলেট, পুরো শরীর ভেদ করে ডানদিকের পায়ের ওপরের অংশে লেজের গোড়া দিয়ে বেরিয়ে গেছে। মার্টিনি চমৎকার অস্ত্র, কিন্তু ওটার বুলেট ছোট ফুটো তৈরি করে বলে ঠিকমত জোরাল ধাক্কা দিতে পারে না। কপাল ভাল, সিংহ মারা সোজা।

'বাকি রাত সিংহের উরুতে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে শুয়ে কাটালাম। লোমের গন্ধ খানিকটা বিরক্ত করল বটে, তবু ভালও লাগল শিকারের কাছে থাকতে। যখন ঘুম ভাঙল, ভোরের ধূসর আলো পুব-দিগন্ত ছুঁয়েছে তখন। প্রথম কিছুক্ষণ বুঝতে পারলাম না মনটা উসখুস করছে কেন, তারপর মরা সিংহের স্পর্শ আর চামড়ার গন্ধ মনে পড়িয়ে দিল, কী পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছি। তাড়াতাড়ি উঠলাম, উদ্‌গ্রীব হয়ে চারপাশে তাকালাম হ্যান্সের কোনও চিহ্ন দেখতে পাব ভেবে। কোনও বিপদ না হয়ে থাকলে ভোর হতেই হাজির হয়ে যাবার কথা তার। কিন্তু ফেরেনি ও। নিরাশ বোধ করলাম। বুঝলাম, কিছু একটা হয়েছে বেচারার। মাশুনকে আগুনটা উস্কে দিতে বলে দ্রুত হাতে সিংহের ছাল ছাড়ালাম। চমৎকার একটা পশু ছিল ওটা। খানিকটা মাংস কেটে নিলাম ওটার দেহ থেকে। ভেজে খেলাম। ভাবতে যত অবাকই লাগুক, সত্যিই খেতে ভাল সিংহের মাংস।

'আমাদের খাওয়া শেষ হতে হতে সূর্য উঠল। পানি খেয়ে গোসল করলাম আমরা পুকুরে, তারপর হায়েনার জন্যে সিংহের অবশিষ্টাংশ ফেলে রেখে রওনা হলাম হ্যান্সকে খুঁজতে। মাশুন আর আমি, আমরা দু'জনই ট্র্যাকিঙে দক্ষ। খুব অসুবিধে হলো না হটেনটটের চিহ্ন খুঁজে এগোতে। এভাবে আধঘণ্টায় মাইল খানেক এগোলাম আমরা। এবার দেখতে পেলাম একটা মর্দা ষাঁড়ের চিহ্ন। ওখানে হ্যান্সের চিহ্নও দেখলাম। চিহ্নের ধরন দেখে বুঝলাম, ষাঁড়টাকে

অনুসরণ করছিল হ্যান্স। একটু পর একটা ঢালের গোড়ায় এসে দাঁড়ালাম। ওখানে একটা বিদঘুটে আকৃতির মিমোসা গাছ জন্মেছে। ওটার শেকড় মাটির ওপরেও বিস্তৃত। তলায় কোনও প্রাণী গভীর একটা খোঁড়ল তৈরি করেছে। ওই কাঁটাঝোপের দশ-পনেরো ফুট সামনে আছে একটা ঘন ঝোপের জঙ্গল।

"'দেখুন, মাকুমাযান, দেখুন," ঝোপের কাছে যেতেই উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল মাগুন। "বাফেলোটা ওকে তাড়া করেছে! দেখুন, এখানে গুলি করতে দাঁড়িয়েছিল ও। দেখুন, পা কীরকম দাবিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওই যে ওর খোঁড়া গোড়ালির চিহ্ন। দেখুন, এখানে বাফেলোটা টিলার ওপর থেকে পাথরের মতো নেমে আসে। মাটি একেবারে চষে ফেলেছে। হ্যান্সের গুলি লেগেছিল ওটার গায়ে। মাটির লেখা আমি সব পরিষ্কার পড়তে পারছি, বাবা!"

"'হ্যাঁ," সায় দিলাম ওর কথায়। "কিন্তু হ্যান্স গেল কোথায়?"

'কথাটা বলার সময়ই আমার বাহু খামচে ধরল মাগুন, কাঁটাঝোপের শেকড়ের দিকটা দেখাল। ভদ্রমহোদয়, ভদ্রমহিলাগণ, দৃশ্যটা কল্পনায় এলে আমি এখনও অসুস্থ বোধ করি।

'গাছের ডালে আট-দশ ফুট ওপরে দেখতে পেলাম হ্যান্সকে। বলা উচিত, হ্যান্সের দেহটাকে। বাফেলো শিং দিয়ে গুঁতিয়ে ওখানে তুলে রেখে গেছে ওকে। ওর একটা পা ডাল পেঁচিয়ে রেখেছে, বোধহয় মৃত্যু যন্ত্রণায় অমনটা হয়েছে। ওর দেহের পাশে, পাঁজরের কাছে বিরাট একটা গর্ত। ওখান দিয়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আছে। শুধু তা-ই নয়, অন্য পা-টা মাটি থেকে পাঁচফুট ওপরে ঝুলছে। চামড়া আর মাংস বেশিরভাগটাই গায়েব। কিছুক্ষণ ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম, তারপর বুঝতে পারলাম কী ঘটেছে। বাফেলোটা স্বভাবজাত জেদের বশে হ্যান্সকে হত্যা করে শত্রুর পা থেকে চামড়া-মাংস তুলে নিয়েছে ক্ষুরের মতো ধারাল জিভ দিয়ে। আগেও এধরনের ঘটনা শুনেছি, কিন্তু সব সময় ভেবেছি, শিকারী গুল মারছে। এবার বিশ্বাস করলাম, ওরকম ঘটে। বেচারি হ্যান্সের কঙ্কালসদৃশ পা আর গোড়ালি প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

'গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা, নিষ্পলক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম বিশ্রী দৃশ্যটা। তবে বেশিক্ষণ নয়। হঠাৎ পনেরো ফুট দূরের একটা ঝোপ ভেঙে গেল আমাদের চমকে দিয়ে। বুনো শুয়োরের ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-এর মতো একটা আওয়াজ পেলাম। সরাসরি আমাদের দিকে ছুটে এলো মর্দা বাফেলোটা। ওই এক পলকেও লক্ষ করলাম, ওটার দেহের পাশে লেগেছে বেচারা হ্যান্সের গুলি। বাফেলোটার পাছার একটা অংশ ক্ষতবিক্ষত। সিংহের সঙ্গে লড়াইয়ের চিহ্ন বহন করছে।'

কথা থামিয়ে দেয়ালে চোখ রাখলেন কোয়াটারমেইন। 'মাথা উঁচু করে ছুটে এলো ওটা। আক্রমণের একেবারে শেষ পর্যায়ে মাথা নিচু করে নেবে। ওই বিরাট কালো কালো শিং দুটো–এখনও যখন দেখছি, মনে হচ্ছে, এই বুঝি তেড়ে আসবে। পেছনে সবুজ ঝোপ আর সামনে ওই প্রকাণ্ড বাফেলো।

'তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ছেড়েই একপাশের ঝোপের দিকে সরে গেল মাশুন। অভ্যেসবশে আট বোরের রাইফেলটা তুললাম। বাফেলোর মাথায় গুলি করাটা অর্থহীন হতো, কারণ গুলি ঠেকিয়ে দিত ওটার শিং। কিন্তু মাশুন দৌড় দেয়ায় বাফেলোটা বাঁক নিতে গেল। ওর পিছু নেবে কি না ভাবতে সময় নিল ওটা। আর এটাই সামান্য সুযোগটা এনে দিল আমাকে। আমার অবশিষ্ট একমাত্র গুলিটা আহত বাফেলোর কাঁধ লক্ষ্য করে ছুঁড়লাম। কাঁধের হাড়ে লাগল ভারী গুলি, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল হাড়, চামড়ার তলা দিয়ে উরু পর্যন্ত গিয়ে থামল। কিন্তুগতি কমল না তাতে ওটার। শুধু একমুহূর্তের জন্যে একটু টলে উঠেছিল।

'এক পাশে ঝাঁপ দিলাম আমি, কাঁটাঝোপের শেকড়ের ফাঁকে গুঁজে দিলাম শরীর। যতটা সম্ভব ভেতরে ঢুকে পড়তে চাইছি তখন। সরাসরি আমার দিকে ছুটে এলো আহত বাফেলো, কাঁধ থেকে একটা পা তখন লড়বড় করে ঝুলছে। এবার শিং দিয়ে গুঁতিয়ে আমাকে বের করতে চেষ্টা করল ওটা। ওরকম একটা গুঁতো গাছের কাণ্ডে লাগল। সে-কারণেই শিঙের মাথা ফাটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়ায় আরও চালাক হয়ে উঠল শয়তানটা। শেকড়ের নীচে শিং ঢুকিয়ে দিল যতোটা পারে, তারপর শিং নেড়ে গেঁথে ফেলতে চেষ্টা করল আমাকে। ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলছিল ওটা, লালা ঝরাচ্ছিল আমার গায়ে। শিঙের আওতার একটু বাইরে রয়ে গেলাম আমি। তবে প্রত্যেকটা গুঁতোয় শেকড়ের ফাঁকের গর্তটা বড় হয়ে যাচ্ছে। আরও বেশি করে মাথা ঢোকাতে সুবিধে হয়ে যাচ্ছে জানোয়ারটার। মাঝেমধ্যেই পাঁজরে ওটার নাকের জোরাল গুঁতো খাচ্ছি। বুঝতে পারলাম, বাঁচতে পারব না এভাবে। মরিয়া হয়ে টেনে ধরলাম ওটার বের হয়ে থাকা জিভ, তারপরই গায়ের জোরে দিলাম মোচড়। ব্যথায়-রাগে চিৎকার করে উঠল বিরাট প্রাণীটা, এতো দ্রুত পিছু হটল যে জিভ ধরা আমিও কয়েক ইঞ্চি বেরিয়ে পড়লাম গর্ত থেকে। আবার গুঁতো মারতে চেষ্টা করল ওটা। এবার আমার শিরদাঁড়ায় শিঙের ডগা বাধাতে পারল।

'অনুভব করলাম, সব শেষ। চিৎকার করে বললাম, "ধরে ফেলেছে আমাকে!" মৃত্যু-আতঙ্কে চিৎকার করছিলাম। "গোয়াসা, মাশুন, গোয়াসা!" (কোপ দাও, মাশুন, কোপ দাও!)

'বাফেলোটা মাথা উঁচু করতেই গর্ত থেকে বের হয়ে পড়তে হলো আমাকেও। তারমধ্যেও দেখলাম, দীর্ঘকায় মাশুন তার চওড়া ফলার বর্শা হাতে এগিয়ে আসছে। আরও সিকি সেকেন্ড পর খসে পড়লাম শিং থেকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলাম বর্শার আওয়াজ, পড়পড় করে মাংসের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে লোহার পাত। চিত হয়ে পড়েছি আমি, তাকিয়ে দেখলাম দুঃসাহসী মাশুন তার বর্শা পুরো এক ফুট বা তারও বেশি ঢুকিয়ে দিয়েছে বাফেলোর বুকে। রক্ত বের হচ্ছে বাফেলোর নাক-মুখ দিয়ে। মাশুনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। শেষ মুহূর্তের বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পালানোর চেষ্টা করল মাশুন।

'কিন্তু বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে তখন। উন্মত্তের মতো হাঁক ছাড়তে

ছাড়তে মাগুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষিপ্ত বাফেলো। শিঙের গুঁতোয় পলকা একটা পালকের মতো উড়াল দিল মাগুন। মাটিতে পড়তেই শিং দিয়ে রাগে ওকে দু'বার ফুটো করল উন্মাদ দানব। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম, মনের ভেতর পাগলামি চিন্তা–যে করে হোক সাহায্য করতে হবে মাগুনকে। এক পা-ও এগোনোর আগে বাফেলোটা খুব জোরে শ্বাস ফেলল, হাঁক ছাড়ল একবার, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল মাগুনের পাশে।

'তখনও বেঁচে ছিল মাগুন, কিন্তু ওকে একবার দেখেই বুঝলাম, পৃথিবীতে সময় শেষ হয়ে গেছে ওর। বাফেলোর শিং বিরাট একটা গর্ত তৈরি করেছে ওর ডান ফুসফুসে। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষতও আছে।

' হাঁটু গেড়ে বসলাম ওর পাশে। ওর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলাম। ফিসফিস করে জানতে চাইল ও, "ও কি মারা গেছে, মাকুমাযান? আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না।"

'"হ্যাঁ, মাগুন, ও মারা গেছে।"

'"ওই কালো শয়তানটা কি তোমার কোনও ক্ষতি করে দিয়েছে, মাকুমাযান?"

'আমার গলা ধরে এলো। কোনরকমে বললাম, "না, মাগুন।"

'"খুব খুশি হলাম," অস্ফুট স্বরে বলল মাগুন।

'তারপর দীর্ঘ নীরবতা নামল। শুধু মাগুন শ্বাস নেয়ার সময় আওয়াজ হলো ফুটো হয়ে যাওয়া ফুসফুসে। একসময় মাগুন বলল, "মাকুমাযান, তুমি কি এখনও আছো? আমি তোমাকে স্পর্শ করতে পারছি না।"

'"আমি আছি, মাগুন।"

'"আমি মারা যাচ্ছি, মাকুমাযান," খুব কষ্ট করে থেমে থেমে বলল মাগুন। "দুনিয়াটা ঘুরছে, মাকুমাযান। আমি অন্ধকারে চলে যাচ্ছি! বাবা, কখনও হয়তো এমন সময় আসবে, যখন তুমি ভাববে, মাগুন তোমার পাশে ছিল। যখন তুমি হাতি মারতে... আমরা... আমরা দু'জন তখন..."

এই ছিল মাগুনের শেষ কথা। বীর মাগুন এভাবেই চলে গেল। ওর দেহটা গাছের নীচের কোটরে নিয়ে এলাম, তারপর ভেতরে ভরে দিলাম। পাশে শুইয়ে দিলাম ওর চওড়া ফলার বর্শা। ওর জাতির নিয়ম অনুযায়ী, এই দীর্ঘ যাত্রায় নিরস্ত্র যাবে না ও। বলতে লজ্জা নেই, তারপর কাঁদলাম আমি। অন্তর নিংড়ে আসা অব্যক্ত বেদনাগুলো ধুয়ে ফেলতে চাইলাম অশ্রুজলে।

আ টেল অভ থ্রি লায়ন্স

এক

দশ শিলিং-এর সুদ

আপনাদের অনেকেই অ্যালান কোয়াটারমেইনের নাম শুনে থাকবেন। কিছুদিন আগে বন্ধুদের নিয়ে রাজা সলোমনের রহস্যময় খনি আবিষ্কারের দুরূহ অভিযানে গিয়েছিলেন তিনি।

সফল হয় ওই অভিযান। ইংল্যান্ডে ফিরে স্যার হেনরি কার্টিসের বাড়ির কাছাকাছি বাস করছিলেন মিস্টার কোয়াটারমেইন। কিন্তু নগর-সভ্যতার বিকট আওয়াজ ও লোকজনের ভিড় সইল না তাঁর বেশিদিন, জঙ্গলে অভ্যস্ত আর সব দক্ষ শিকারীর মতো বিরক্ত হয়ে আবারও ফিরে গেলেন তিনি বুনো অঞ্চলে। শুনলাম নতুন কোনও অভিযানে রওনা হচ্ছেন এক অচেনা দেশে।

তারপর অনেকগুলো দিন পেরিয়ে গেল, তাঁর বা তাঁর সঙ্গী-সাথীদের কোনও খোঁজ-খবর পেলাম না আর। এবারের অভিযাত্রা থেকে অ্যালান কোয়াটারমেইন আর ফিরবেন বলে মনে হলো না আমার। সলোমনের গুপ্তধন নিয়ে ফিরে এসে তিনি যখন ইংল্যান্ডে ছিলেন, প্রায়ই তাঁর বাড়িতে চলে যেতাম গল্প শুনবার আশায়। দীর্ঘ শিকারী জীবনে অদ্ভুত সব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি, মুগ্ধ হয়ে শুনতাম সেইসব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনি।

আজ আমি যে কাহিনি বলতে যাচ্ছি, সেটাও তাঁর সেই অভিজ্ঞতারই গল্প। তখনও তাঁর ছেলে হ্যারি মারা যায়নি। সেই অভিযানে হ্যারিকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। হ্যারির বয়স তখন বড়জোর চোদ্দো।

ইয়র্কশায়ারের বাড়িতে সে-রাতে অ্যালান কোয়াটারমেইন যেভাবে আমাকে বলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই কাহিনিটি তুলে দিচ্ছি আপনার জন্য।

কথা হচ্ছিল সোনার খনি আর শিকার নিয়ে–

'ও, গোল্ড মাইনিং?' মাথা দোলালেন অ্যালান কোয়াটারমেইন, 'হুঁ, ট্র্যান্সভালের পিলগ্রিম'স রেস্ট-এ সোনার খনির খোঁজে গিয়েছিলাম আমি। তার পরে ঘটে জিম-জিম আর সিংহগুলোর সেই ঘটনা। ...পিলগ্রিম'স রেস্ট-এর নাম শুনেছেন? বিদঘুটে একটা ছোট শহর ছিল ওটা। হয়তো এখনও আছে। পাথুরে একটা উপত্যকার মাঝখানে পিলগ্রিম'স রেস্ট, চারপাশ থেকে উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা। রুক্ষ, অনুর্বর, বিশ্রী একটা জায়গা। ওখানে সোনা খুঁজতে গিয়ে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে হাত থেকে শাবল-কোদাল ফেলে দিয়েছি আমি বহুবার, বুক ভরে একটু শ্বাস নিতে ক্লেইম ফেলে রেখে কয়েক মাইল হেঁটে চলে গিয়েছি কোনও পাহাড়ের চূড়ায়। ওখানে ঘাসের গালিচায় শুয়ে দেখেছি মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি–সবুজ সব ঝলমলে উপত্যকা, সূর্যের আলোর সোনামাখা সুউন্নত পাহাড়শ্রেণী, বিস্তৃত-উন্মুক্ত-সুনীল আকাশ। মাইনারদের জঘন্য রসিকতা আর গালাগালি থেকে দূরে সরে গিয়ে পেয়েছি ক্ষণিকের স্বস্তি। আজও মনে পড়ে রোদে বিরামহীন কাজ করে যাওয়া বাসুটু কাফ্রিদের কর্কশ কণ্ঠস্বর।

'কয়েক মাস ধৈর্য ধরে ক্লেইমে কাজ করবার পর শাবল বা খনিজ পরিষ্কার করবার চৌবাচ্চার দিকে তাকালেই ঘৃণা বোধ করতে শুরু করলাম। দিনে অন্তত একশোবার নিজের দুর্ভাগ্যকে অভিশাপ দিতাম সোনা খুঁজতে গিয়ে আটশো পাউন্ড বিনিয়োগ করেছি বলে। সে-সময় ওই আটশো পাউন্ডই ছিল আমার সর্বস্ব। আসলে স্বর্ণজ্বর ভয়ানক ভাবে পেয়ে বসে মানুষকে, আমাকেও পেয়েছিল ওই জ্বরে। লোভ করা পাপ, সেই লোভেরই প্রতিফল ভোগ করছিলাম তখন।

'আমি যে ক্লেইমটা কিনেছিলাম, শুনেছিলাম ওটা থেকে পাঁচ-ছ' হাজার পাউন্ড মূল্যের সোনা পেয়েছে আগের মালিক। কাজেই ওই ক্লেইম পাঁচশো পাউন্ডে কিনতে পেরে ভেবেছিলাম, বিরাট জেতা জিতে গেছি। যাম্বেযির ওপারে এক বছর হাতি শিকার করে বহু কষ্টে রোজগার করেছিলাম ওই টাকা। যখন দেখেছিলাম আমেরিকান ক্লেইম-বিক্রেতা আমার দেয়া পাঁচশো পাউন্ড আনন্দের সঙ্গে তার প্যান্টের পকেটে ঢোকাচ্ছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলাম, "সত্যিই, টাকাগুলো ভাল জায়গাতেই বিনিয়োগ করেছি। আশা করি আমার ভাগ্যটাও আপনার মতো ভাল হবে।"

'হেসেছিল লোকটা। স্নায়ু উত্তেজিত ছিল তখন, মনে হয়েছিল আমার করুণ ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েই হেসেছে আমেরিকান। নাকি সুরে বলেছিল, "মানুষের পেটে লাথি মারব এমন লোক নই আমি, আর এখন যখন নোংরা টাকা নিয়ে স্বার্থের বিরোধ নেই আমাদের, তো সরাসরি সত্য কথা বলাই ভাল মনে হচ্ছে—ওই ক্লেইম থেকে অনেক টাকার সোনা পেয়েছি আমি ঠিক, কিন্তু তোমার-আমার মধ্যে যদি খাঁটি কথা বলি, তা হলে বলতে হয়, ক্লেইমটায় একফোঁটা সোনাও নেই আর!"

'নির্লজ্জ আমেরিকানের কথা শুনে হাঁ করে বারকয়েক খাবি খেয়েছিলাম। মাত্র পাঁচ মিনিট আগেই লোকটা দুনিয়ার সমস্ত ধর্মের বিভিন্ন স্বর্গদূতের নামে শপথ করে বলছিল এখনও অনেক সোনা রয়ে গেছে ক্লেইমে, কোদাল চালিয়ে সোনা বের করে আনতে আনতে ক্লান্ত হয়ে গেছে বলেই শুধু ক্লেইমটা বিক্রি করে দিচ্ছে সে।

'"অত হতভম্ব হবার কিছু নেই, বাছা," আমার অবস্থা দেখে সান্ত্বনার সুরে বলেছিল পাজি আমেরিকান। "বুড়ি মেয়েটার মধ্যে খানিকটা সোনালী ঝিলিক থেকেও থাকতে পারে এখনও, বলা যায় না। থাকুক আর না থাকুক, তুমি কিন্তু সত্যিকারের ভাল একজন মানুষ, কাজেই স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বিরাট বড়লোক হয়ে যাবার মিথ্যে আশায় মনপ্রাণ দিয়ে গর্ত খোঁড়ার দুর্দান্ত সুযোগ পাচ্ছ তুমি। ...আর কিছু হোক বা না হোক, হাতের পেশী ফুলে শক্ত হয়ে যাবে তোমার। পাথরের মতো কঠিন ওখানে মাটি। আর এসবও যদি তোমাকে খুশি না করে থাকে, তা হলে ভাবো একবার, আগামী একবছরে দু'হাজার ডলারের বেশি দামের অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলতে পারবে তুমি।"

'তারপর কথা শেষ হতে না হতেই আমার চোখের সামনে থেকে কেটে পড়ল আমেরিকান ঠগ। একেবারে ঠিক সময়ে। আরেকটু সময় পেলেই ঝাঁপিয়ে

পড়তাম লোকটার উপর।

'যা-ই হোক, আমার ছেলে হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ছ'জন কাফ্রিসহ সেই পুরোনো ক্লেইমে কাজে লেগে পড়লাম। কাফ্রিদের ভাড়া করতে গিয়ে, সবার খাবার কিনতে গিয়ে খরচ হয়ে গেল সর্বস্ব। কাজ করলাম আমরা–হ্যাঁ, কাজ কাকে বলে! ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিনের পর দিন খুঁড়েও সামান্য সোনার চিহ্ন দেখলাম না। একতিলও না। আমেরিকান বাটপার চেঁছেপুঁছে নিয়ে গেছে সব, আমাদের জন্য ফেলে রেখে যায়নি কিছু। একেবারে কিছুই না!

'তিনটে মাস হাড়ভাঙা খাটুনির পর টাকা প্রায় শেষ হয়ে এলো। এক ব্যাগ মাংসের দাম চার পাউন্ড হলে বুঝতেই পারছেন, বেশিদিন লাগবার কথা নয় আমার সামান্য সঞ্চয় শেষ হতে।

'তারপর একদিন এলো সেই বিশেষ দিন শেষে রাতের আঁধার। শনিবার রাত। খাওয়া শেষে আমার ছেলে হ্যারিকে নিয়ে টিলার পাশে চাঁদের আলোয় বসলাম। পাশেই আমাদের খনন করা বিরাট সেই গর্ত যেন টিটকারি দিচ্ছে নীরবে। পা ঝুলিয়ে দিয়েছি আমরা গর্তের কিনারা দিয়ে। দু'জনের মনের অবস্থা বর্ণনা করবার মতো নয়। একটু পরে মানিব্যাগ বের করে ভিতরে যা কিছু আছে তালুতে ঢাললাম। অর্ধেকটা সভরেইন, দুটো ফ্লোরিন, রূপার কয়েনে নয় পেন্স–ব্যস!

"'বুঝলি, হ্যারি," ছেলেকে বললাম, "দুনিয়ায় এই কয়টা পয়সা ছাড়া আর কিছু নেই আমাদের। বাকি সব এই গর্তটা গিলে নিয়েছে।"

"'এখন থেকে কাফ্রিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করব আমরা, আর খাব সবাই ভুট্টার ছোবড়া," ঠাট্টার সুরে বলল হ্যারি। হাসতে শুরু করল নিজের কৌতুকে।

'হাল্কা মেজাজে ছিলাম না আমি, এতো খাটুনির পর ফতুর হয়ে মেজাজটা ছিল চড়া। গর্ত খোঁড়া কখনোই আমার পছন্দের কাজ ছিল না। বিরক্ত হলাম হ্যারির কথায়। ঘাড়ে চাপড় মারতে হাত তুলে বললাম, "চুপ কর্ তো!' হাত তুলতেই অর্ধেক সভরেইনটা আঙুলের ফাঁক গলে ফস্কে পড়ে গেল গর্তের মধ্যে। "যাহ্!' হাহাকার করে উঠলাম, "গেল!"

"'তা হলেই দেখো, বাবা, রেগে গেলে কীরকম ভুল করে ফেলো তুমি," উপদেশের সুরে বলল হ্যারি। "আরও কমে গেল আমাদের টাকা।"

'কোনও জবাব দিলাম না ওর হিতোপদেশের, খাড়া ঢাল বেয়ে নামলাম গর্তের ভিতরে। পিছনে এলো হ্যারি। অনেক খুঁজলাম কয়েনটা, কিন্তু চাঁদের আলো ছিল ম্লান। সভরেইনটা তো পাওয়া গেলই না, কাফ্রিরা এদিকে সন্ধ্যার আগে কাজ করে যাওয়ায় আলগা মাটিতে পা রাখাও হলো মুশকিল। রাগে একটা শাবল তুলে নিয়ে মাটি খুঁচিয়ে কয়েন খুঁজতে শুরু করলাম। না পেয়ে রাগ বাড়ল আরও, পাগলের মতো গায়ের জোরে শাবল চালাতেই আমাকে অবাক করে দিয়ে শাবলটার হাতল পর্যন্ত দেবে গেল মাটির বুকে।

"'হ্যারি, এখানে কেউ কাজ করেছিল মনে হয়!" অবাক হয়ে বললাম।

'হ্যারি বলল, "আমার তা মনে হয় না, বাবা। তবুও ভালমত দেখি এসো।"

'কোদাল দিয়ে মাটি সরাতে শুরু করলাম আমি, হ্যারি সরাল দু'হাতে। একটু পরে বলল, "ধুর, কয়েকটা পাথরের মাঝ দিয়ে ঢুকে গিয়েছিল শাবলটা। দেখো," একটা পাথর ধরে টানতে শুরু করল ও। কয়েক মুহূর্ত পর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "বাবা, খুব ভারী তো! ধরে দেখো!" বিরাট বড় আপেলের সমান গোলচে একটা বাদামি পাথরখণ্ড দিল ও আমার হাতে। কৌতূহলী হয়ে চাঁদের আলোয় পাথরটা দেখলাম। সত্যিই ওটার ওজন অস্বাভাবিক বেশি। চাঁদের আলোয় পাথরের রুক্ষ শরীরটা দেখে বুকের মাঝে উত্তেজনার ছোঁয়া টের পেলাম। তবে যা দেখলাম সেটা সত্যি কি না নিশ্চিত হতে পারলাম না।

'"তোর ছুরিটা দে তো, হ্যারি।" হাত বাড়িয়ে দিলাম। ছুরিটা নিয়ে পাথর রাখলাম হাঁটুর উপর, তারপর আঁচড়াতে শুরু করলাম ছুরির ফলা দিয়ে। নরম মনে হলো পাথরটা! কয়েক সেকেন্ড পর স্বপ্ন আর স্বপ্ন থাকল না, সত্যিই দেখলাম ওটা আমার হাতে বিরাট একখণ্ড নিরেট, নিখাদ সোনার পিণ্ড! ওজন চার পাউন্ডের বেশিই হবে ওটার। "সোনা পেয়েছি আমরা, হ্যারি!" ছেলেকে বললাম, "এটা সোনা না হলে আমি ডাচদের মতো উন্মাদ!"

'বড় বড় চোখে ধাতুর খণ্ডে যেখানে আমি আঁচড় দিয়েছি, সেই জায়গার সোনালী ঝিলিকের দিকে তাকাল হ্যারি। আর, তারপরই বিকট এক চিৎকার ছাড়ল। উপত্যকার বহুদূর পর্যন্ত চলে গেল ওর কণ্ঠস্বর। মনে হলো খুন করা হচ্ছে কাউকে।

'"চুপ কর্," তাড়াতাড়ি ধমকে বললাম ওকে, "তুই কি চাস চারপাশের সব চোর-ডাকাত এসে হাজির হোক?"

'কথাটা বলেও সারিনি ঠিকমত, কারও সাবধানী পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, এদিকেই আসছে। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের টুকরোটা মাটিতে রেখে বসে পড়লাম ওটার উপর। এবার ওটাকে খুব শক্ত মনে হলো। বসতে না বসতে গর্তের কিনারায় রোদে পোড়া শুকনো একটা চেহারা দেখতে পেলাম, ছোট ছোট কুঁতকুঁতে চোখে আমাদের দিকে তাকাল সে। লোকটাকে চিনতে দেরি হলো না, এদিকে ওই "হ্যান্ড-স্পাইক টম"-এর দুর্নাম রয়েছে। তার ওই নাম হয়েছে হীরার খনিতে কাজ করবার সময় সঙ্গীকে সে হ্যান্ড-স্পাইক দিয়ে খুন করেছিল বলে। কোনও সন্দেহ নেই, লোকটা এখন মানব-হায়েনার মতো এদিকে ঘুরঘুর করছে কিছু চুরি করা যায় কি না সে-উদ্দেশ্যে।

'"তুমি নাকি, *আন্টার* কোয়াটারমেইন?" জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'"হ্যাঁ, আমিই, মিস্টার টম," ভদ্রতার সঙ্গে উত্তর দিলাম।

'"ওই চিৎকারের কারণটা কী?" সামনে ঝুঁকল সে। "নক্ষত্র নিয়ে ভাবতে ভাবতে কাছ দিয়েই যাচ্ছিলাম, বেরিয়েছি সন্ধ্যার হাওয়া খেতে, এমন সময় চিৎকার কানে এলো। প্রথমে মনে হলো কেউ মরে যাচ্ছে; কান পেতে শুনলাম তখন, তারপর বুঝতে পারলাম, ওটা খুশির চিৎকার। নিশ্চয়ই কেউ সোনার পিণ্ড পেয়েছে। কোয়ারটারমেইন, ঠিক বলছি না আমি? সত্যিই সোনা পাওয়া গেছে, ঠিক কি না?" চপচপ শব্দে বারকয়েক ঠোঁট দুটো খুলল আর বন্ধ করল হ্যান্ড স্পাইক টম। "বড় কোনও পিণ্ড পেয়েছ তুমি হঠাৎ করে, ঠিক কি না?"

'"না, ওটা মোটেই..." দৃঢ় স্বরে আপত্তি করতে গিয়েও থেমে গেলাম আমি লোকটার কালো চোখে নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ব্যাটা যদি বোঝে আমি কীসের উপর বসে আছি, তা হলে আজ রাত শেষ হবার আগেই বুকে স্পাইক গেঁথে মারা পড়ব।

'শুনেছি সোনার উপর গড়ালে সেটা আনন্দদায়ক, কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, বসে পড়ে পিছনদিকে কেউ আরাম পেতে চাইলে যেন আমার মতো স্বর্ণখণ্ডের উপর না বসেন। "কী ঘটেছিল যদি জানতে চান, মিস্টার টম," খুব ভদ্রতার সঙ্গে বললাম, "তা হলে শুনুন। আমার সঙ্গে আমার ছেলের একটু মতবিরোধ হয়েছিল। আমার মতটা ওকে ভালমত বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। ওর চিৎকারের আর কোনও কারণ নেই।"

'হ্যান্ড-স্পাইক টমের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করে উপায় কী! খুন-খারাপি করতে লোকটা যেরকম অভ্যস্ত, তাতে...

'"তা-ই, মিস্টার টম," ফোঁপাতে শুরু করল হ্যারি। ছেলেটার আমার বুদ্ধি ছিল। বুঝতে পেরেছিল কোন্ ধরনের সমস্যায় পড়েছি আমরা। "বাবা মারছিল বলে চেঁচাচ্ছিলাম।"

'"তা-ই নাকি, বাছা? তা-ই? তা হলে আমি শুধু এটুকুই বলব, রাত দশটার সময় পুরোনো একটা ফুরিয়ে যাওয়া ক্লেইমে এসে বাপের সঙ্গে তর্ক করাটা অদ্ভুত।" নিষ্ঠুর হাসল লোকটা হ্যারির দিকে চেয়ে। "আরেকটা কথা, বাছা, আমার সঙ্গে যদি কখনও বে-আদবী করতে, তা হলে ওরকম খুশির চিৎকারের মতো আওয়াজ ছাড়তে পারতে না। আর কিছু বলার নেই আমার, পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না, কাজেই শুভরাত্রি জানাব এখন।" ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল হতাশ লোকটা, ঠিক যেন কোনও ক্ষুধার্ত শেয়াল, সহজ শিকারের খোঁজে চলেছে।'

'"স্রষ্টাকে ধন্যবাদ," সোনার পিণ্ডের উপর থেকে উঠে স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললাম। "উঠে পড়ে দেখ্ তো, হ্যারি, ওই শয়তানটা গেছে কি না।"

'হ্যারি একটু পরে জানাল, লোকটা পিলগ্রিম'স রেস্টের দিকে চলে গেছে। কাজে লাগলাম বাপ-ব্যাটা। বুক দুরুদরু করছে। হাত কাঁপছে উত্তেজনায়। শাবল যেখানে গেঁথে গিয়েছিল, সে-জায়গায় সাবধানে হাতড়ালাম দু'জন। যা ভেবেছিলাম, ওরকম স্বর্ণপিণ্ড আরও পেলাম। মোট বারোটা। ছোটটা হেযেল বাদামের সমান, বড়টা যেন হাঁসের ডিম। প্রথমটা ছিল অবশ্য অন্যগুলোর চেয়ে অনেক বড়। পিণ্ডগুলো সব ওখানে জড় হলো কী করে সেটা একটা রহস্য হয়ে থাকল। পরে অবশ্য জানলাম, সেই আমেরিকানও একটা জায়গাতেই তার সমস্ত সোনা পেয়েছিল। পরবর্তী ছ'মাস মাটি খুঁড়ে আর একতিল সোনাও কপালে জোটেনি তার, ফলে হতাশ হয়ে ক্লেইমটা বিক্রি করে দেয়।

'যা-ই হোক, পরে পিণ্ডগুলোর দাম জানলাম–প্রায় বারোশো পঞ্চাশ পাউন্ড। মোট কথা ওই বিশ্রী গর্তে যত টাকা ঢেলেছিলাম, তার চেয়ে চারশো পঞ্চাশ পাউন্ড বেশি ফিরে পেলাম। সবগুলো পিণ্ড রুমালে বেঁধে ফেললাম আমি, কিন্তু একবারে এত টাকার সম্পদ বাড়ি নিয়ে যেতে সাহস পেলাম না। ভালমতই

জানি, রাত-বিরেতে শিকারে বেরিয়েছে মিস্টার হ্যান্ড-স্পাইক টম। শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম, যেখানে আছি সেখানেই সে-রাতের মতো অপেক্ষা করব। রাত কাটানো সহজ হবে না, কিন্তু রুমালে জড়ানো সোনার টুকরোগুলো তো আছে, সে-কারণে কষ্টটা গায়েও লাগবে না। ওগুলো আমার হারানো দশ শিলিং-এর সুদ।

'রাতটা ধীরে ধীরে কাটতে লাগল। হ্যান্ড-স্পাইক টমের ভয়ে ঘুমাতে সাহস পেলাম না। শেষপর্যন্ত ভোর হলো। আমার সজাগ দৃষ্টির সামনে পুবাকাশে ফুটে ওঠা বিশাল কমলারঙা ফুলের মতো দেখা দিল সূর্য। সূর্য-রশ্মির ছোঁয়া লাগল এক পাহাড়ের চূড়া থেকে অন্য পাহাড়ের চূড়ায়। সেদিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো আমার। ওরকম আগে কখনও মনে হয়নি। বুঝে ফেললাম, গত কয়েক মাসে গর্ত খুঁড়তে গিয়ে যে-পরিশ্রম করেছি, তাতে বাকি জীবন আর সোনার খনিতে কাজ করা মোটেই ঠিক হবে না আমার। তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, পিলগ্রিম'স রেস্ট ছেড়ে চলে যাব, বাফেলো শিকার করতে করতে এগোব ডেলাগোয়া উপসাগরের দিকে।

'সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যেতেই শাবল-কোদাল তুলে নিলাম হাতে, দিনটা রোববার সকাল হলেও ডেকে তুললাম হ্যারিকে, দু'জন মিলে খুঁজে দেখতে শুরু করলাম আশপাশে আরও স্বর্ণখণ্ড আছে কি না। বুঝতে পারছিলাম, থাকবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আমরা যা পেয়েছি, সবই ছিল ছোট্ট একটা গর্তমত জায়গায়। ওখানে মাটি ছিল একদম অন্যরকম। পেলাম না আর একতিল সোনা। এদিকে আরও সোনা আছে সেটা হতেই পারে, তবে সিদ্ধান্ত তো নেয়া হয়েই গেছে আমার, সোনা যদি কেউ পায়, তো সে আমি হবো না কিছুতেই। পরে শুনেছি, ওই গর্ত আশাবাদী দু'তিনজন লোকের ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হয়েছিল। আরেকটু হলে আমারও সর্বনাশ করে দিত ওই গহ্বর।

'সোনা খোঁজা সারা হলে ছেলেকে বললাম, "হ্যারি, এই সপ্তাহেই ডেলাগোয়ার দিকে রওনা হয়ে যাব বাফেলো শিকার করতে। তুই কি আমার সঙ্গে যাবি, না তোকে ডারবানে পাঠিয়ে দেব?"

'"আমাকেও নাও, আমাকেও নাও," তাড়াতাড়ি করে বলল উদ্‌গ্রীব হ্যারি, "আমি একটা বাফেলো মারতে চাই!"

'"আর বাফেলোই যদি তোকে মেরে ফেলে?"

'"তাতে কী," হাসতে হাসতে বলল হ্যারি, "আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানে আমার মতো আরও অনেক আছে।"

'বড়দের মতো কথা বলবার কারণে ধমক দিলাম ওকে, তবে সিদ্ধান্ত নিলাম, নেব ওকে সঙ্গে।

দুই
ডোবায় যা পাওয়া গেল

'আধা সভরেইন হারিয়ে বারোশো পঞ্চাশ পাউন্ডের সোনা পাবার পনেরো-ষোলো দিন পর সেই বিটকেলে গর্তের বদলে একদম অন্যরকম প্রকৃতির মাঝে চলে এলাম আমরা। চাঁদের রূপালী আলোর প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে জমিন। ক্যাম্প করেছি আমরা ঢেউ খেলানো একটা বিস্তৃত সমতলের কিনারায়, ঢালের শেষে। আমরা বলতে হ্যারি, দু'জন কাফ্রি, আমি ও ছ'টা ষাঁড়সহ একটা স্কচ কার্ট।

'জমিতে ঝোপ জন্মেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, কোথাও বা আবার একসঙ্গে কয়েকটা করে। এখানে ওখানে সমতল-মাথা মিমোসা গাছ। ঢালু জায়গায় গভীর খাদ তৈরি করে আমাদের ডানদিক দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটা উচ্ছল ঝর্না। রাতের নীরবতায় মিষ্টি শোনায় ওটার কলধ্বনি। ঝর্নার দু'তীরে জন্মেছে মেইডেনহেয়ার, বুনো অ্যাসপারাগাস ও নানান রকমের ঘাস। লাল গ্র্যানাইটের খাতের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঝর্নার পানি, শত শত বছরের জলপ্রবাহ কঠিন গ্র্যানাইটের বুকে সৃষ্টি করেছে বড় বড় চৌবাচ্চার মতো গর্ত। গোসলের সময় ওগুলোর একটাকে আমরা ব্যবহার করলাম বাথটাবের মতো করে। ক্যাম্পের চারপাশে মিমোসা কাঁটাঝোপ দিয়ে বেড়া তৈরি করেছি সিংহের ভয়ে, ওখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে যেরকম রাজকীয় গোসলখানা আমরা পেলাম, তেমন চমৎকার পরিবেশে গোসলের সুযোগ পায়নি কখনও কোনও রোমান নারী, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

'থাবার চিহ্ন দেখে বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি আমার, আশপাশে বেশ কয়েকটা সিংহ আছে। কাজেই সাবধান থাকলাম।

'এক জায়গায় জমি থেকে বড় একটা অংশ ভেঙে নিয়ে গেছে পানির ঘূর্ণি, ওখানে এককোনায় অপূর্ব সুন্দর একটা প্রাচীন মিমোসা গাছ। গাছের নীচে বিরাট একখণ্ড গ্র্যানাইটের মসৃণ চাপড়া। ওটাকে ঘিরে রেখেছে মেইডেনহেয়ার ও অন্যান্য ফার্ন গাছ। গ্র্যানাইটের চাপড়া ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে ছোট্ট একটা স্বচ্ছ পানির ঝকঝকে ডোবায়। ডোবাটা মাঝখানে দশ ফুট চওড়া হবে, পানির গভীরতা বড়জোর পাঁচ ফুট। এই গ্র্যানাইট হয়ে ডোবায় নেমে গোসল করতাম আমরা প্রতিদিন সকালে। ওই শিকার অভিযানে ওখানে গোসলের চমৎকার অভিজ্ঞতাটা ছিল আমার বড় প্রাপ্তি। একইসঙ্গে, ওই জায়গাটা হয়ে আছে আমার জন্য অত্যন্ত বেদনারও স্মৃতি।

'সে-রাতটা ছিল অপূর্ব। আগুনের ধারে বসে ছিলাম হ্যারি আর আমি। সকালে হ্যারি একটা হরিণ শিকার করেছিল, ওটার মাংস দিয়ে কাবাব তৈরি করছিল কাফ্রি দু'জন। হ্যারি আর আমি, দু'জনই ছিলাম উৎফুল্ল। না থাকার কোনও কারণ ছিল না। অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশে সবাই আমরা ছিলাম তৃপ্ত।

আফ্রিকার জ্যোৎস্না রাতের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে হলে দক্ষ ভাষাবিদ লাগবে, আমার মতো অনভিজ্ঞ মানুষের পক্ষে ওরকম রাতের সত্যিকার রূপ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। উত্তরে যতদূর চোখ যায়, রহস্যময় কোন্ অজানা দেশের দিকে যেন চলে গেছে ঢেউ খেলানো ঝোপের নীরব সাগর। আমাদের ক্যাম্প থেকে খানিকটা নীচে, মাইলখানেক ডানদিকে বয়ে চলেছে চওড়া ওলিফ্যান্ট নদী। চাঁদের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হচ্ছে নদীর আয়নার মতো জলে। রূপালী আলোর বর্শা নেমে এসে এঁকেবেঁকে শিউরে উঠছে ওলিফ্যান্টের বুকে, তারপর ওখান থেকে ঠিকরে যাচ্ছে বহুদূরের নিথর পাহাড় ও নিস্তব্ধ সমতলভূমিতে। নদীর তীরে জন্মেছে বিরাট সব গাছ, যেন স্বর্গের দিকে আঙুল তাক করেছে ওগুলো রাতের চাদর যেন মেঘের মতো ঢেকে রেখেছে গাছগুলোর শীর্ষ সবখানে বিরাজ করছে নীরবতা–আকাশের উদারতায়, ঘুমন্ত পৃথিবীর বুকে–সবখানে ওরকম মায়াবী পরিবেশে মানুষ ভুলে যায় সে কত ক্ষুদ্র, প্রকৃতির বিশালত্বে অংশ নিতে পারে সে বিভোর হয়ে, তখনই হয়তো আসে মহৎ সব দর্শন-চিন্তা।

"'হার্ক, ওটা কী?"

'দূরে নদীর দিক থেকে ভেসে এলো মেঘ ঢাকবার মতো গর্জন। আবার! আবারও! খাবারের খোঁজে বেরিয়েছে ক্ষুধার্ত সিংহ!

'হ্যারিকে শিউরে উঠতে দেখলাম। ফ্যাকাসে হয়ে গেল ও। এমনিতে হ্যারি যথেষ্ট সাহসী, কিন্তু রাতের আঁধারে ঝোপঝাড়ের নীরব রাজ্যে জীবনে প্রথমবারের মতো সিংহের গর্জন শুনলে যে-কোনও কিশোরের স্নায়ু চমকে যাবে।

"'ওরা নদীর তীরে শিকার করছে," হ্যারিকে বললাম, "তোর দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তিনরাত ধরে এখানে আছি আমরা, ওরা যদি দেখা দিতে চাইত, তা হলে এরইমধ্যে আমরা ওদের দেখতে পেতাম। তবে সাবধানের মার নেই. আগুনটা উস্কে দেব আমরা।" কাফ্রিদের একজনকে বললাম, "ফারাও, ঘুমিয়ে পড়ার আগে তুমি আর জিম-জিম আরও কিছু কাঠ এনে রাখো, আগুন না জ্বললে বিড়ালগুলো হয়তো ঘাড়ের কাছে চলে আসবে।"

'সোয়াযি জাতির শক্তিশালী মানুষ ফারাও, পিলগ্রিম'স্ রেস্ট-এ আমার সঙ্গে কাজ করেছে। কথা শুনে হেসে ফেলল ও, উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে ডাক দিল জিম-জিমকে কুঠার নিয়ে আসতে। জিম-জিম আসবার আগেই রওনা হয়ে গেল ও একঝাড় শ্যুগার-বুশের দিকে। ওখান থেকে মরা গাছ কেটে এনে জ্বালানীর কাজে লাগিয়েছি আমরা এর আগে।

'মানুষ হিসেবে ফারাও ছিল ব্যতিক্রমী। সম্ভবত মিসরীয় ধাঁচের চেহারা আর রাজকীয় ভঙ্গিতে হেলেদুলে হাঁটবার কারণেই ওকে ফারাও নামে ডাকা হতো। কখন কীসে যে ও রেগে যাবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা ছিল না। খুব কম মানুষই মিশতে পারত ওর সঙ্গে। ...আর কখনও যদি মদ গিলবার সুযোগ পেত ফারাও, তা হলে গলা পর্যন্ত না গিলে থামতে পারত না। মাতাল হলেই ও হয়ে উঠত রক্তপিপাসু। এসব তো হচ্ছে ওর খারাপ দিক, আর ওর ভাল দিক

হচ্ছে, বেশিরভাগ জুলুদের মতোই, কাউকে যদি ফারাও পছন্দ করত, তা হলে তার জন্য করতে পারত না এমন কাজ ছিল না। কর্মঠ আর বুদ্ধিমান মানুষ ছিল ফারাও, ওর মতো দুঃসাহসী আর জেদী লোক আমি খুব কমই দেখেছি। একবার কোনকিছু করবে বললে সেটা ও করে ছাড়ত। বয়স ছিল ওর পঁয়ত্রিশের মতো। তবে কেশলা বা তাজ ছিল না ওর। সোয়াযিল্যান্ডে বোধহয় কোনরকমের কোনও গোলমালে জড়িয়ে পড়েছিল, যে-কারণে ওর উপজাতি ওকে কেশলা দিয়ে সম্মানিত করেনি। সম্ভবত এ-কারণেই সোনার খনিতে কাজ করতে চলে এসেছিল ফারাও।

'অন্য কাফ্রি জিম-জিম বয়সে ফারাওয়ের চেয়ে বেশ ছোট। ওকে তরুণ বলা চলে। ও ছিল মাপোক কাফ্রি। একটু পরে আমি যা বলব, তারপরেও ওর সুনাম করতে পারছি না। অলস আর বেয়াড়া ধরনের বখাটে ছোকরা ছিল জিম-জিম। সেই সকালেই ফারাওকে বলতে হয়েছিল, যেন ছোকরাকে শাসন করে। ওর অবহেলাতে আমাদের একটা ষাঁড় হারিয়ে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই। জিম-জিমকে পছন্দ করলেও ভালরকম পিট্টি দিয়েছিল সকালে ফারাও। পরে দেখেছিলাম জিম-জিমকে সান্ত্বনা দিচ্ছে ও, নিজের কানের ভাঁজে রাখা কৌটা থেকে নস্যি টানতে দিয়ে বলছে, পরেরবার যখন ও জিম-জিমকে পেটাবে, তখন অন্যহাত দিয়ে পেটাবে। তা হলে আগের কাটাদাগগুলোর পাশে পড়বে নতুন দাগগুলো, জিম-জিমের পিঠে তৈরি হবে চমৎকার নকশা।

'যা-ই হোক, দু'জন ওরা চলে গেল কাঠ আনতে। রাতের বেলা ক্যাম্প ছেড়ে যেতে সায় ছিল না জিম-জিমের, চাঁদের উজ্জ্বল আলো থাকলেও ভয় পাচ্ছিল ও। কিছুক্ষণ পর অবশ্য নিরাপদেই ফিরল ওরা কাঠের বিরাট একটা বোঝা নিয়ে। হাসতে হাসতে জিম-জিমকে জিজ্ঞেস করলাম সে কিছু দেখেছে কি না। ও বলল, দেখেছে। একটা ঝোপের পিছন থেকে হলদে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। নাক ঝাড়বার আওয়াজও শুনেছে ও।

'ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখলাম। বুঝতে দেরি হলো না, ওসবই জিম-জিমের কল্পনা। জিম-জিমের কথা শুনে আমি যে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম, তা নয়, তারপরও আগুনটা ভালমত জ্বলে উঠবার পর ঘুমাতে গেলাম কাঁটাঝোপের বেড়ার ভিতরে। হ্যারির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বেশিক্ষণ লাগল না।

'কয়েকঘণ্টা পর চমকে ঘুম ভাঙল আমার। প্রথমে বুঝতে পারলাম না কেন ঘুমটা ভেঙেছে। চাঁদটা ডুবে গেছে, অথবা দিগন্ত বিস্তৃত ঝোপঝাড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। ওটার লালচে আভা দেখা যাচ্ছে শুধু। বাতাস ছেড়েছে। তারাভরা রাতের আকাশে একদিক থেকে আরেকদিকে ছুটে চলেছে মেঘের সারি। রাতের পরিবেশটা যেন বদলে গেছে হঠাৎ করেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ভোর হতে এখনও অন্তত দু'ঘণ্টা বাকি।

'ষাঁড়গুলো বরাবরের মতোই বাঁধা আছে স্কচ কার্টের সঙ্গে। তবে ওগুলোকে খুব অস্থির মনে হলো। নাক ঝাড়ছে, সেইসঙ্গে ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে। বারবার উঠে দাঁড়াচ্ছে, আবার শুচ্ছে। মনে হলো কোনও বুনো জন্তুর গন্ধ

পেয়েছে ওগুলো। কীসের গন্ধ পেয়েছে তা বুঝতে পারলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পঞ্চাশ গজের মধ্যে হুঙ্কার ছাড়ল একটা সিংহ। খুব জোরে হুঙ্কার দেয়নি, তবে আমার হৃৎপিণ্ড কণ্ঠার কাছে উঠে আসবার জন্যে আওয়াজটা যথেষ্ট ছিল।

'কার্ট-এর আরেকপাশে শুয়ে ছিল ফারাও, ওটার তলা দিয়ে তাকিয়ে ওকে মাথা তুলে শুনবার ভঙ্গিতে দেখলাম। "সিংহ, ইনকূস," ফিসফিস করে বলল ফারাও, "সিংহ!"

'লাফ দিয়ে উঠেছে জিম-জিম। স্বল্প আলোয় ওকে ভীষণ আতঙ্কিত মনে হলো।

'বিপদের জন্যে তৈরি থাকতে চাই বলে ফারাওকে বললাম আগুনে আরও কাঠ দিতে। হ্যারিকে ডেকে তুললাম। না ডেকে তুললে কেয়ামত হয়ে গেলেও ঘুম থেকে ও জাগত বলে মনে হয় না। প্রথমে ভয় পেল ও, তারপর উত্তেজিত হয়ে উঠল, উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকল বনের রাজাকে সামনে থেকে দেখতে পাবার আশায়। রাইফেল হাতে তৈরি হয়ে গেলাম আমি। হ্যারিকে ওর রাইফেলটা দিলাম। একটা ওয়েস্টলি রিচার্ডস্ ফলিং ব্লক ওটা। কিশোরদের জন্যে চমৎকার একটা অস্ত্র–হালকা, কিন্তু বড় জন্তু শিকারের উপযোগী। এবার অপেক্ষায় থাকলাম আমরা।

'অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল, কিছু ঘটল না। ভাবতে শুরু করলাম, ভাল হয় আবার ঘুমানোর চেষ্টা করলে। ঠিক তখনই বিশ গজ দূর থেকে আওয়াজটা শুনতে পেলাম। ওটা কোনও গর্জন নয়, যেন কাশল কেউ। বাইরে তাকালাম সবাই, দেখতে পেলাম না কিছু। অধীর উত্তেজনায় পেরিয়ে গেল আরও খানিকটা সময়। স্নায়ুতে চাপ পড়ছে আমাদের। যখন তখন যে-কোনওদিক থেকে হামলা করে বসতে পারে সিংহ, আবার হামলা না-ও করতে পারে। সবকিছুই অনিশ্চিত। এরকম পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়েও হ্যারির কারণে দুশ্চিন্তা হতে লাগল আমার। বিপদের মুহূর্তে প্রিয় মানুষের উপস্থিতিতে অনেকসময় দিশে হারিয়ে বসে অনেকে। পরিবেশটা বেশ হিমেল, তারপরও নাক বেয়ে ঘাম পড়ছে, টের পেলাম। মানসিক চাপ দূর করতে মনোযোগ দিলাম একটা গুবরে পোকার দিকে। আগুনের আলোয় আকৃষ্ট হয়েছে পোকাটা, আগুনের কাছে বসে চিন্তিত ভঙ্গিতে শুঁড়দুটো ঘষছে।

'হঠাৎ গুবরে পোকাটা এমন বিরাট লাফ দিল যে আরেকটু হলেই আগুনের ভিতরে গিয়ে পড়ত। ভীষণ চমকে লাফ দিলাম আমরাও। বেড়ার ঠিক বাইরে থেকে গর্জন করে উঠেছে একটা সিংহ। ওটার হুঙ্কারের প্রচণ্ডতায় থরথর করে কাঁপল স্কচ কার্ট। এতো কাছ থেকে ভয়ঙ্কর গর্জন শুনে শ্বাস নিতে ভুলে গেলাম।

'বিস্ময়ের আওয়াজ করল হ্যারি, জিম-জিম হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল। নিরীহ ষাঁড়গুলো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল মাটিতে।

'চাঁদ ডুবে যাওয়ায় রাতটা নিকষ কালো হয়ে আসছে। মেঘের দল নক্ষত্রের আলো ঢেকে দিয়েছে। আগুনের আলো ছাড়া আর কোনও আলোর উৎস নেই

কোথাও। আগুনটা অবশ্য ভালভাবেই জ্বলছে। তবে ওই আলোয় গুলি করে লক্ষ্যভেদ প্রায় অসম্ভব। অন্ধকার চিরে বেশিদূরে যায় না লালচে আভা। কিন্তু কেউ যদি বাইরের অন্ধকারে থাকে, তা হলে আগুনটা বহুদূর থেকে দেখতে পাবে সে।

'এসময় ষাঁড়গুলো হঠাৎ সিংহের গায়ের গন্ধ পেল। যা ভয় পাচ্ছিলাম, তা-ই হলো, দড়ি ছিঁড়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করল ভয়ে উন্মাদ বোকা জানোয়ারগুলো। ষাঁড়দের এই নির্বুদ্ধিতা সিংহদের জানা আছে, যে-কারণে সিংহ অনেকসময় এমন জায়গা বেছে অবস্থান নেয়, যাতে তার গায়ের গন্ধ পায় ষাঁড়ের দল। ষাঁড়গুলো ভয় পেয়ে দড়ি ছিঁড়ে ঝোপেঝাড়ে পালাতে শুরু করে। আর ঝোপঝাড়ে ঢুকবার পর একাকী যে-কোনও ষাঁড় অন্ধকারে হয়ে পড়ে অসহায় শিকার। সিংহ নিজের পছন্দমত ষাঁড় বাছাই শেষে শিকার করে নেয় তখন।

'চরকির মতো ঘুরতে শুরু করল আমাদের ষাঁড় ছয়টা। ওদের হুড়োহুড়ি-ছুটোছুটি-ধাক্কাধাক্কিতে আরেকটু হলেই পিষে মারা পড়তাম আমরা, অথবা হতাম মারাত্মক আহত। তড়িঘড়ি সরে গেলাম সবাই ওদের কাছ থেকে। তারপরও হ্যারির পা মাড়িয়ে দিল একটা ষাঁড়, ষাঁড়গুলোকে একসঙ্গে পাশাপাশি বেঁধে রাখবার দড়িটার হ্যাঁচকা টানে কাঁটাঝোপের বেড়ার আরেকপাশে আমার কয়েক ফুট দূরে উড়ে এসে পড়ল বেচারা জিম-জিম।

'কার্ট-এর জোয়ালটা ভেঙে গেল মট করে। যদি না ভাঙত, তা হলে উল্টে পড়ত কার্ট। তবে কার্ট উল্টে পড়ল কয়েক মিনিট পরেই। ছয়টা ষাঁড়, কার্ট, জোয়াল, ষাঁড় একত্রে বাঁধবার দড়ি–সবকিছু তালগোল পাকিয়ে পরিণত হলো বিদঘুটে একটা স্তূপে। স্তূপটা নড়ছে, সরছে, হাম্বা-হাম্বা ডাক বের হচ্ছে ওটা থেকে–মনে হলো ওখান থেকে কিছুই আর আলাদা করা সম্ভব হবে না কখনও।

'এই গোলমেলে পরিস্থিতির মধ্যে বিশৃঙ্খলার মূল কারণ ওই সিংহটার দিকে মনোযোগ দিতে পারলাম না কয়েকটা মুহূর্ত, ভাবতে চেষ্টা করলাম এরকম বিপদের মধ্যে কী করা যায়। ষাঁড়গুলো যদি ছুটে যায়, তা হলে যেরকম ভয় পেয়েছে তাতে দিশে হারিয়ে দৌড়াতে থাকবে। তার মানে হারিয়ে যাবে ওগুলো ঝোপঝাড়ে। ষাঁড় না থাকলে আমাদের কী অবস্থা হবে ভাবতে গিয়ে আবার সিংহের চিন্তা মাথায় ঢুকল আমার।

'আগুনের আভায় দ্রুত ভেসে আসতে দেখলাম যেন হলদেটে কিছু একটা।

"'সিংহ! সিংহ!" চিৎকার করল ফারাও।

'ভুল বলেছে ফারাও, ওটা সিংহী। ক্ষুধার্ত, চিমসানো পেটওয়ালি বিরাট এক সিংহী। খিদের জ্বালায় পাগল হয়ে উঠেছে। আমাদের সাধের বেড়া টপকে মাঝখানে এসে ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়াল ওটা, লেজ নাড়তে নাড়তে গর্জন ছাড়তে লাগল। দেরি না করে রাইফেলটা তুলেই গুলি করলাম সিংহীকে লক্ষ্য করে। কিন্তু ওই স্বল্প আলোয় হুড়োহুড়ির মধ্যে হতচকিত আমার গুলি জানোয়ারটার গায়ে লাগল না। আরেকটু হলেই গুলি খেত ফারাও। তবে রাইফেলের আগুনের

ঝিলিক কাজে এলো, চারপাশে অবস্থাটা একপলকে দেখে নিতে পারলাম। ষাঁড়গুলো কার্ট ঘিরে পাগলের মতো ঘুরছে। একপাশে যেখানে পড়েছিল, সেখানেই চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে জিম-জিম, কাঁটাঝোপের ঘেরের মাঝখানে জ্বলন্ত চোখে চারপাশে তাকানোর ফাঁকে ঘুরছে ক্ষুধার্ত সিংহী। তারপর গর্জন ছেড়ে কী করবে সে-সিদ্ধান্ত নিল ওটা।

'সিদ্ধান্তটা নিতে সময় লাগল না বেশি, রাইফেলের নল থেকে আগুনের ঝিলিক মিলিয়ে যেতে না যেতেই নাক দিয়ে কুৎসিত একটা আওয়াজ ছেড়ে বেচারা জিম-জিমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সিংহী। আরেকবার গুলি করবার সুযোগ পেলাম না, তার আগেই হতভাগ্য তরুণের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনতে পেলাম। শূন্যে উঠে গেল ওর পা দুটো। ঘাড় কামড়ে ধরে এক ঝাঁকিতে জিম-জিমকে পিঠের উপর তুলে নিয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বিরাট এক লাফে চলে গেল সিংহী কাঁটাঝোপের বেড়ার ওপারের অন্ধকারে। মনে হলো ঝর্নার যেখানে গোসল করতে যাই আমরা, সেদিকেই শিকার নিয়ে চলে গেল ছুটন্ত জানোয়ারটা। ভয়ে-আতঙ্কে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা সবাই, তারপর পাগলের মতো ছুটলাম সিংহীর পিছনে। একের পর এক গুলি করলাম হ্যারি আর আমি, মনে আশা, গুলির কারণে ভয় পেয়ে জিম-জিমকে ফেলে যদি পালায় শয়তান সিংহী। অন্ধকারে কিছুই দেখা সম্ভব হলো না আমাদের পক্ষে। শুনলামও না কিছু। জিম-জিমকে নিয়ে রাতের আঁধারে অদৃশ্য হয়েছে ক্ষুধার্ত শ্বাপদ। দিনের আলো ফুটবার আগে হিংস্র জন্তুটাকে অনুসরণ করতে যাওয়া পাগলামি হবে, কাজেই সে-চেষ্টা করলাম না। করলে আমাদেরকেও হয়তো জিম-জিমের পরিণতিই বরণ করে নিতে হতো।

'দুঃখ ভারাক্রান্ত ভীত মন নিয়ে কাঁটাঝোপের বেড়ার ভিতরে চলে এলাম আমরা, ভোরের আলো ফুটবার অপেক্ষায় থাকলাম। আলো না ফুটলে জিম-জিমের খোঁজে যাওয়া বা ষাঁড়গুলোকে জটলা থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করা অর্থহীন, কাজেই বসে থেকে চিন্তা করা ছাড়া আর কিছু করবার রইল না। মনে মনে আমরা আশা করতে থাকলাম, কোনভাবে বেঁচে গেছে দুর্ভাগা জিম-জিম।

'ঘণ্টাখানেক পর ঝোপে ছাওয়া দীর্ঘ ঢাল বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এলো ভোরের আলো, ওই আলো পড়ে ঝকঝক করে উঠল ষাঁড়গুলোর শিং। ভয়ে ফ্যাকাসে মুখে অসহায় জন্তুগুলোর জটলা ছাড়ানোর কাজ শুরু করলাম আমরা। আলো আরেকটু বাড়লে যখন সিংহীর চিহ্ন অনুসরণ করতে পারব বুঝলাম, ততক্ষণে ষাঁড়, কার্ট ও দড়ি-দড়ার জট ছাড়াতে পেরেছি। আরেকটা সমস্যার কথা জানতে পারলাম কাজটা সেরে। আমাদের সেরা ষাঁড়টা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওটার দায়িত্ব ফারাওকে দিয়ে রাইফেল হাতে হ্যারিকে নিয়ে সরে গেলাম আরেকদিকে। জিম-জিমের কোনওকিছু পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখতে শুরু করলাম দু'জন।

'আমাদের ছোট্ট ক্যাম্পের চারপাশের জমি পাথুরে, কঠিন। সিংহীর পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম না কোথাও। তবে কাঁটাঝোপের বেড়ার বাইরে কয়েক

ফোঁটা রক্ত চোখে পড়ল। ক্যাম্প থেকে আন্দাজ তিনশো গজ দূরে খানিকটা ডানদিকে আছে মিমোসা আর শ্যুগার-বুশ মেশানো একটা বড়সড় ঝোপে ভরা জায়গা। আমার অভিজ্ঞতা বলল, ওখানে গেছে সিংহী, ওখানে বসেই খেয়েছে জিম-জিমের লাশ।

'শিশিরে ভিজে মাথা নোয়ানো লম্বা ঘাসের মাঝ দিয়ে সাবধানে এগোলাম আমরা ঝোপঝাড়ে ভরা জায়গাটার দিকে। দু'মিনিট পুরো হবার আগেই উরু পর্যন্ত চুপচুপে হয়ে ভিজে গেল হ্যারি আর আমার। কিছুক্ষণ পর পৌঁছে গেলাম নির্দিষ্ট জায়গাটায়। সকালের কাঁচা আলো গাছের নীচে সেভাবে পৌঁছায়নি, চারপাশ কেমন যেন অন্ধকারমত। আলোর অভাব আরও সতর্ক করে তুলল আমাকে। প্রতিটা মুহূর্ত মনে হতে লাগল, এখনই দেখব শয়তান সিংহীটা হতভাগ্য জিম-জিমের রক্তাক্ত হাড় চাটছে। তবে দেখা পেলাম না শ্বাপদটার। জিম-জিমের আঙুলের হাড়ও খুঁজে পাওয়া গেল না ওখানে। এর একটাই মানে, সিংহী ওখানে ঢোকেনি।

'ধীরে ধীরে সম্ভাব্য অন্যান্য সমস্ত জায়গা ঘুরে দেখলাম আমরা, ফলাফল হলো আগেরই মতো।

"'ওকে বোধহয় অনেক দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে খেয়েছে," দীর্ঘশ্বাস ফেলে একসময় বললাম হ্যারিকে। "বেঁচে নেই জিম-জিম, আমাদের সাহায্য করবার চেষ্টা আর কোনও কাজে আসবে না ওর। স্রষ্টা ওর ভাল করুন। ...এবার কী করা যায়?"

"নোংরা হয়ে গেছে শরীর, ডোবায় গিয়ে পরিষ্কার হওয়া দরকার," বাস্তব-বাদীর মতো বলল আমার ছেলে। "খিদেও লেগেছে খুব। মুখ-হাত ধুয়ে ক্যাম্পে গিয়ে কিছু খাবো।"

'ওর কথাগুলো খুব আবেগশূন্য মনে হলেও যুক্তি আছে কথায়, এটা আমাকে স্বীকার করতে হলো। তবে শুনতে ভাল লাগল না। আমরা মুখ-হাত ধোবো, আর ওদিকে কিছুক্ষণ আগেই কোথায় কে জানে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলেছে সিংহীটা বেচারা জিম-জিমকে! তবে আবেগ দিয়ে সবসময় জীবন চলে না। কাজেই ঝর্নার ধারে আমাদের পছন্দের সেই বাথটাবের মতো জায়গাটায় চলে এলাম পরিচ্ছন্ন হতে। হ্যারির আগে আমিই পৌঁছলাম ওখানে। সরসর করে ফার্ন সরিয়ে নামতে শুরু করলাম, তার পরপরই পাক খেয়ে ঘুরলাম চরকির মতো। চিৎকার বেরিয়ে এলো গলা চিরে। চিৎকার আসতেই পারে, আমার পায়ের কাছে দাঁত খিঁচিয়ে ভয়ঙ্কর রাগে গা শিউরানো ঘড়ঘড় গর্জন ছেড়েছে কিছু একটা।

'আরেকটু হলেই সিংহীটার পিঠের উপর উঠে পড়েছিলাম আমি। গ্র্যানাইটের যে মসৃণ খণ্ডে দাঁড়িয়ে আমরা গা শুকাই, সেটার উপর ঘুমাচ্ছিল জানোয়ারটা।

'সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রাইফেলটা কক করবার আগেই এক লাফে স্বচ্ছ ডোবা পেরিয়ে গেল সিংহী, অদৃশ্য হলো উল্টোদিকের তীরে। চিন্তা করতে যতটুকু সময় লাগে, তার মধ্যেই ঘটে গেল সমস্ত ব্যাপারটা, চিন্তা শেষে কিছু করবার

সুযোগ পেলাম না আর।

'গ্র্যানাইটের চাপড়ার উপর দেখতে পেলাম জিম-জিমের রক্তাক্ত দেহাবশিষ্ট। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে পাথরটা।

'"বাবা! বাবা!" হ্যারির উত্তেজিত কণ্ঠ কানে এলো, "পানিতে কী দেখো!"

'তাকালাম চৌবাচ্চার দিকে। শান্ত-স্বচ্ছ জলের মাঝখানে ভাসছে জিম-জিমের ছিন্ন মস্তক! কামড়ে মাথাটা আলাদা করে ফেলেছে সিংহী, ঢালু পাথর থেকে গড়িয়ে পানিতে গিয়ে পড়েছে ওটা।

তিন

জিম-জিম হত্যার প্রতিশোধ

'আর কখনও ওখানে ওই চৌবাচ্চায় গোসল করিনি আমরা। ফার্নে ঘেরা চমৎকার ওই জায়গাটার দিকে তাকালেই আমার মনে পড়ত জিম-জিমের কাটা মাথাটার কথা। ধরতে গেলেই পানিতে ডিগবাজি খাচ্ছিল মুণ্ডুটা। বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর তোলা গিয়েছিল ওটা।

'বেচারা জিম-জিম। ওর দেহের সামান্য যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেটা রুটির একটা বস্তায় পুরে কবর দিলাম। বেঁচে থাকতে বদঅভ্যেসের কারণে পছন্দ করতাম না জিম-জিমকে, কিন্তু ওর মৃত্যু কাঁদাল আমাদের। হাউমাউ করে কাঁদল হ্যারি, জুলু ভাষায় জঘন্য গালাগাল করতে লাগল ফারাও অসহায় রাগে, আমি শপথ করলাম, যদি সম্ভব হয়, আমার বয়স আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা বেড়ে যাবার আগেই ওই সিংহীর ঝাঁজরা শরীরের ভিতরে দিনের আলো ঢুকবে।

'কিন্তু খুনি সিংহীটাকে খতম করব কীভাবে? প্রশ্নটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি, খিদে পেলেই আবার এদিকে ফিরে আসবে শয়তানটা। কিন্তু খিদে ওটার লাগবে কখন? জিম-জিমকে যেভাবে খেয়ে প্রায় শেষ করে গেছে, তাতে সামনের রাতে ওটা ফিরবে বলে মনে হলো না। অবশ্য ফিরতেও পারে ওটার বাচ্চা থেকে থাকলে। যখনই ফিরুক, এবার যাতে আমাদের চোখ না এড়ায়, তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

'জিম-জিমকে কবর দিয়ে কাজে নামলাম আমরা। প্রথমেই আরও ঝোপ নিয়ে এসে ক্যাম্পের চারধারের কাঁটাঝোপের বেড়া মজবুত করে তুললাম, খেয়াল রাখলাম কাঁটাগুলো যেন উপরের দিকে থাকে। একটা সিংহী যদি কাঁটাঝোপ ডিঙিয়ে হাজির হতে পারে, তা হলে দলের অন্যগুলোও পারবে, কাজেই সাবধান না হয়ে উপায় নেই। বেড়া দুর্ভেদ্য করবার কাজটা সেরে সিংহীটাকে আবার এদিকে টেনে আনা যায় কী করে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলাম। আচম্বিতে হাজির হওয়ার বদঅভ্যেস আছে সিংহদের, ঠিক যখন কেউ ভাবছে না সিংহ আসতে পারে। আবার ফাঁদ পেতে রাখলে ধারেকাছেও ঘেঁষে না। বিশেষ করে নরখাদকগুলো অসম্ভব চালাক হয়।

'সিংহী যদি জিম-জিমকে খেয়ে তৃপ্তি পেয়ে থাকে, তা হলে জিম-জিমের মতো আরও শিকারের লোভে আসতেও পারে। তবে সে-ভরসায় থাকলে আমাদের চলবে না।

'বাস্তববাদী হ্যারি প্রস্তাব রাখল, ফারাও কাঁটাঝোপের বেড়ার ওপারে গিয়ে চাঁদের আলোয় টোপ হয়ে বসুক, সিংহী ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই গুলি করে সিংহীকে মেরে ফেলব আমরা, কাজেই চিন্তার কিছু নেই ওর। ফারাও অবশ্য হ্যারির প্রস্তাবে মোটেই খুশি হলো না, হ্যারি ওরকম একটা ভয়ঙ্কর প্রস্তাব রেখেছে বলে রাগে গজগজ করতে করতে হেঁটে চলে গেল আরেকদিকে

'তবে হ্যারির কথায় আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো।

"'আরেহ্, তা-ই তো!" বলে উঠলাম আমি, "আমাদের অসুস্থ ষাঁড়টাকে তো কাজে লাগানো যায়! ওটা তো এমনিতেই মরবে!"

'ক্যাম্প থেকে তিরিশ গজ বামে নদীর দিকে নেমে যাওয়া ঢালের গোড়ায় আছে বহুবছর আগে বাজ পড়ে ঝলসে যাওয়া একটা মরা গাছ। ওটা থেকে প্রায় পনেরো ফুট দূরে দু'পাশে জন্মেছে দুটো ঝোপ। ওই ঝোপগুলোর কাছে মরা গাছটার সঙ্গে ষাঁড়টাকে বাঁধলেই ভাল হয় বলে মনে হলো। সূর্যাস্তের একটু আগে বেচারা ষাঁড়টাকে নিয়ে গিয়ে গাছের কাণ্ডে বেঁধে রেখে এলো ফারাও। শুরু হলো আমাদের অপেক্ষার পালা। কাঁটাতারের বেড়ার ভিতর আগুন জ্বাললাম না আমরা। চাই না আগুনের আলোয় সতর্ক হয়ে উঠুক, বা ভয় পাক সিংহী।

'ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলাম আমরা, ঘুম তাড়ালাম পরস্পরকে চিমটি কেটে। এখানে বলে রাখা ভাল, যে চিমটি দেয় আর যে চিমটির শিকার হয়, চিমটি কত জোরে দেয়া হয়েছে সে-বিষয়ে দু'জনের মতপার্থক্য থাকে বিস্ময়কর রকমের বেশি। যা-ই হোক, চিমটা-চিমটিই সার হলো, সিংহীর দেখা পাওয়া গেল না। একসময় হেলতে হেলতে দিগন্তে মুখ লুকাল চাঁদ, পৃথিবীটাকে যেন গপ্ করে গিলে নিল অন্ধকার। আমাদের গিলতে হাজির হলো না কোনও সিংহ-সিংহী। ঘুমাতে ভয় পেলাম বলে ভোর পর্যন্ত জেগেই থাকলাম আমরা, তারপর মনের গভীরে একগাদা খারাপ চিন্তা নিয়ে শুয়ে পড়লাম। তাতে অবশ্য বিশ্রাম হলো না বললেই চলে।

'সেদিন সকালে শিকারে বের হলাম। ক্লান্ত আমরা, হতাশ, তারপরও যেতে হলো শুধু আমাদের মাংস ফুরিয়ে গেছে বলে। তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জ্বলন্ত সূর্যের নীচের ঘুরে বেড়ালাম শিকার করবার মতো কিছু একটার দেখা পাবার আশায়, রোদে ঝলসে পুড়ে লাভ হলো না, পেলাম না কোনও শিকার। অজানা কোনও কারণে এদিকে আসতে ভয় পাচ্ছে তৃণভোজী প্রাণীরা। অথচ মাত্র দু'বছর আগে যখন এসেছিলাম, গণ্ডার আর হাতি ছাড়া সবধরনের বড় শিকারের প্রাচুর্য দেখেছিলাম এদিকে। এখনও এদিকটাতে রয়ে গেছে শুধু একগাদা সিংহ। মনে হলো শিকারের অভাবই বোধহয় সিংহগুলোর এতটা হিংস্র আব সাহসী হয়ে উঠবার কারণ। বিরক্ত করা না হলে সিংহ সাধারণত বেশ ভদ্র

প্রাণী, কিন্তু ক্ষুধার্ত সিংহ প্রায় ক্ষুধার্ত মানুষের মতোই বিপজ্জনক। সিংহের সাহস নিয়ে নানাজনের নানারকম ভিন্ন মত রয়েছে, কিন্তু আমার ধারণা বনের রাজার সাহস কতটা হবে সেটা নির্ভর করে তার পেটের অবস্থার উপর। ক্ষুধার্ত সিংহ রাইফেলকে লাঠির সমান গুরুত্বও দেয় না, কিন্তু পেটভরা থাকলে ওই সিংহই পালাবে সামান্যতম হুমকির মুখে।

'যা-ই হোক, শিকারে বেরিয়ে হন্যে হয়ে ঘোরাই সার হলো আমাদের, একটা ছোট অ্যান্টিলোপ বা বুশ বাকও দেখতে পেলাম না। শেষপর্যন্ত ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গিয়ে মেজাজ খারাপ করে ফিরতি পথ ধরলাম। বেশ খাড়া একটা টিলার কাঁধ ধরে ফিরছি ক্যাম্পের দিকে। একটু পর টিলার চূড়ায় উঠলাম। থমকে দাঁড়ালাম ওখানেই। বামদিকে ছ'শো গজ দূরে নীলাকাশে অপূর্ব খাঁজকাটা সিং তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটা পূর্ণবয়স্ক মর্দা কুডু **(Tragelaphus strepsiceros Kudu.)**। অতটা দূর থেকেও ওটার দেহের দু'পাশের সাদা ডোরাগুলো স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মাছির জ্বালাতন থেকে রক্ষা পেতে খাড়া কানদুটো নাড়ছে প্রকাণ্ড হরিণ।

'ওটাকে দেখে ভাল লাগল, কিন্তু কথা হচ্ছে, শিকারকে বাগে পাব কী করে? ছ'শো গজ দূর থেকে গুলি করে কুডুটাকে মারা প্রায় অসম্ভব। ওরকম ঝুঁকি পাগলেও নেবে না। এদিকে জমিও এমন নয় যে লুকিয়ে এগোতে পারব। বাতাসও থেমে গেছে। অনেক দূর থেকে আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে যাবে জন্তুটা। চিন্তা করে দেখলাম, ওটাকে শিকার করতে হলে ঘুরপথে যেতে হবে অন্তত মাইলখানেক রাস্তা। উল্টোদিক থেকে এগিয়ে কাছাকাছি গিয়ে হয়তো শিকার করা যাবে ওটাকে। হ্যারিকে পাশে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে বললাম কী করতে হবে। আমার কথা শেষ হতে না হতেই পরিশ্রম থেকে আমাদেরকে বাঁচাতেই যেন টিলার উপর থেকে বিদ্যুদ্গতিতে ছুটে নেমে আসতে শুরু করল মর্দা কুডু। বুঝলাম না কী দেখে ওটা ভয় পেয়েছে, হবে হয়তো কোনও হায়েনা বা চিতাবাঘকে এগিয়ে আসতে দেখেছে। আগে কখনও কোনও হরিণকে এতো দ্রুত দৌড়াতে দেখিনি। ওটাকে হারাতে হবে ভেবে হ্যারির উপস্থিতি ভুলে গালাগাল দিয়ে ফেললাম। হ্যারি অবশ্য স্থির দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখল অপূর্ব হরিণটা কোন্‌দিকে যায়। চোখের পলকে একসার ঝোপের পিছনে চলে গেল কুডু, কয়েক সেকেন্ড পর ঝোপ থেকে বের হলো আবার। আমাদের শ'পাঁচেক গজ দূরে চলে এসেছে। সমতল জায়গাটায় বড় বড় পাথরখণ্ড পড়ে রয়েছে। বিরাট বিরাট লাফে ওগুলো ডিঙিয়ে ছুটল কুডু। চট্ করে হ্যারির দিকে তাকালাম। অবাক হলাম ওকে রাইফেল কাঁধে তুলতে দেখে। "আরে গাধা, কিছুতেই তুমি..." বলতে না বলতে গর্জে উঠল ওর রাইফেল।

'শিকারী জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাটা তখনই দেখলাম। লাফ দিয়ে শূন্যে উঠেছিল কুডু, পিছনের পা গুটিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল পাথরের একটা স্তূপ। হঠাৎ করে ঝাঁকি দিয়ে পাগুলো সোজা করল ওটা; মাটিতে নেমে দাঁড়িয়ে পড়তে চাইল, মনে হলো পিছনের পা দুটো শূন্যে তুলে শিঙের উপর দাঁড়িয়ে আছে মর্দা কুডু। একটা সেকেন্ড মাত্র। তারপর গড়িয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল জন্তুটা।

"'অবিশ্বাস্য!" না বলে পারলাম না, "গুলিটা লেগেছে! মারা গেছে ওটা!"

'এ-কথার কোনও জবাব দিল না হ্যারি, ওর চোখে-মুখে তীব্র বিস্ময় দেখলাম। বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক, পাঁচশো গজ দূর থেকে ছুটন্ত কোনও হরিণকে গুলি করে ফেলে দেয়া অসম্ভব একটা কাজ। এক হাজারটা গুলি করলেও। অথচ পেরেছে হ্যারি। তাড়াহুড়োয় রাইফেলের সাইটে চোখও রাখেনি ও। এরকম অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য আর কোনও শিকারীর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

'কথা না বাড়িয়ে হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলাম হরিণটা যেখানে পড়ে আছে। নিথর দেহটার ঘাড়ে নিখুঁত গোল একটা ফুটো দেখলাম। ঘাড়ের হাড় ভেঙে দিয়েছে বুলেট, ভার্টেব্রা ছিন্নভিন্ন করে অন্যপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

'কুডুটার দেহ থেকে সেরা মাংস বেছে কাটলাম আমরা যতটা বয়ে নেয়া সম্ভব, তারপর শেয়াল আর শকুনকে ভয় দেখানোর আশায় ওটার পাঁচফুট দীর্ঘ শিংগুলোর মাথায় লাল একটা রুমাল বেঁধে ক্যাম্পে ফিরলাম। বিকেল নেমেছে ততক্ষণে। আমাদের কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল ফারাও, আমরা হাজির হতে না হতেই খুশি-খুশি ভাব করে জানাল, আরেকটা ষাঁড় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এরকম একটা দুঃসংবাদও উৎফুল্ল হ্যারিকে বিমর্ষ করতে পারল না, মনে হলো ওর গুলিতে কুডু মারা যাওয়াটাকে ও "ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে" ধরনের কিছু বলে মানতে রাজি নয়, পুরো কৃতিত্ব দিচ্ছে ও নিজের লক্ষ্যভেদের দক্ষতাকে। লক্ষ্যভেদে হ্যারি যদিও যথেষ্ট ভাল, কিন্তু কুডুর গায়ে গুলি লাগাতে পারা স্রেফ ওর কপাল, সেটা জানিয়ে দিলাম ওকে সোজাসুজি।

'রাতে কুডুর মাংসের কাবাব খেলাম। ওটার বয়স আরেকটু কম হলে মাংস আরও সুস্বাদু হতো। যা-ই হোক, সময় হয়ে গেল জিম-জিমের খুনির জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনবার। আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হতভাগ্য অসুস্থ ষাঁড়টাকে বেঁধে রাখতে হবে বাজপড়া গাছের সঙ্গে। ফারাও জানাল, সারাদিন একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে হেঁটেছে ষাঁড়টা। কোনও কোনও রোগে মারা যাবার আগে ওরকম ঘুরে ঘুরে হাঁটে গবাদি পশু। এখন আর ষাঁড়টার হাঁটবার শক্তিও নেই, এক জায়গায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে সামনে পিছনে ঢুলছে। আগের রাতের মতোই মরা গাছটার সঙ্গে ওটাকে বেঁধে রেখে এলাম আমরা। ভাল করেই জানি, রাতে যদি সিংহীর আক্রমণে না-ও মরে, সকাল হতে হতে মারা পড়বে বেচারা। ভয় পাচ্ছিলাম তখনই না মরে যায়। মরে গেলে টোপ হিসেবে কোনও কাজে আসবে না ওটা। নিজের শিকার করা মড়ার কাছে বারবার ফিরে এসে মাংস খেলেও খিদেয় মরো মরো না হলে সিংহ কখনও অন্য মড়া ছোঁয় না।

'আগের রাতের অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি শুরু হলো আবার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে থেকে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল হ্যারি। এভাবে অপেক্ষার প্রহর গুনতে

অভ্যস্ত আমি, তারপরও ঘুমে চোখ বুজে এলো আমার। ঘুমিয়েই পড়ছিলাম আরেকটু হলে, এমন সময় হঠাৎ করে আমাকে ধাক্কা দিল ফারাও। ফিসফিস করে বলল, "শুনুন!"

'একসেকেন্ড পার হবার আগেই পূর্ণ সজাগ হয়ে গেলাম। বাজপড়া গাছের ডানদিকের ঝোপ থেকে শুনতে পেলাম ডাল ভাঙার হালকা মটমট আওয়াজ। আবার হলো আওয়াজটা। কিছু একটা নড়ছে ওখানে। সাবধানে। ধীরে ধীরে। কিন্তু নড়ছে। রাতটা এতো বেশি নিঃশব্দ যে ওই সামান্য আওয়াজও শুনতে পেলাম স্পষ্ট।

'হ্যারিকে ডাক দিয়ে তুললাম ঘুম থেকে। উঠেই "কোথায় ওটা? কোথায় ওটা?" বলে রাইফেল তাক করতে শুরু করল ও। যেরকম হুড়োহুড়ি করছিল তাতে সম্ভাব্য শিকার সিংহীটার কোনও বিপদ না হলেও আমাদের বা ষাঁড়গুলোর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারত।

"'চুপ করে থাক্!" চাপা স্বরে ধমক দিলাম ওকে। ধমক দিতে না দিতেই শুনতে পেলাম নিচু একটা হিংস্র গর্জন। একপাশের ঝোপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে ষাঁড়টাকে পার হয়ে ওপাশের ঝোপে গিয়ে ঢুকল হলদে একটা রেখা। ভয়ে গুঙিয়ে উঠল অসুস্থ ষাঁড়টা, তারপর টলতে টলতে ঘুরে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। স্পষ্ট দেখলাম ওটাকে চাঁদের উজ্জ্বল আলোয়। মনটা ছোট হয়ে গেল বেচারাকে ওরকম ভয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছি বলে। একপলক মাত্র দেখেছি সিংহীটাকে, অতটুকু সময়ের মধ্যে গুলি করবার কোনও প্রশ্নই আসে না। রাতের আঁধারে শিকার খুব কাছে এসে স্থির হয়ে না দাঁড়ালে গুলি করা অর্থহীন। চাঁদের আলোয় রাইফেলের ফোরসাইট দেখা যায় না বললেই চলে, যে-কারণে রাতেরবেলা খুব কাছ থেকেও সহজ শিকারে ব্যর্থ হতে পারে যে-কোনও দক্ষ শিকারী।

"'আবার আসবে ওটা," চাপা স্বরে বললাম হ্যারিকে। "চোখ-কান খোলা রাখ্, কিন্তু আমি না বললে ভুলেও গুলি করিস না।"

'হ্যারি জবাব দেবার আগেই আবারও দেখা দিল সিংহী, এবারও আক্রমণ না করে তীরবেগে পাশ কাটিয়ে গেল ষাঁড়টাকে।

"'করছে কী সিংহীটা?" ফিসফিস করল হ্যারি।

"'বিড়াল যেমন মেরে ফেলার আগে ইঁদুর নিয়ে খেলে, সেরকম খেলছে বোধহয়। খেলা শেষ হলেই মারবে ষাঁড়টাকে।"

'এবার আমার কথা শেষ হতে না হতেই ঝোপের ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে অসুস্থ ষাঁড়ের উপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পার হয়ে গেল সিংহী। ঝলমলে চাঁদের আলোয় শ্বাপদটার লাফিয়ে শিকার পার হয়ে যাওয়া দেখতে অপূর্ব লাগল। মনে হলো কেউ যেন শিখিয়েছে ওকে এই খেলাটা।

"'মনে হয় কোনও সার্কাস থেকে পালিয়েছে ওটা," ফিসফিস করল হ্যারি। "দারুণ লাগল লাফটা দেখতে।"

'জবাব দিলাম না, শুধু ভাবলাম, সত্যি যদি সিংহীটা সার্কাস থেকে পালিয়ে এসে থাকে, তবুও হ্যারি ঠিকমত ওটার নৈপুণ্যের প্রশংসা করতে পারেনি। তবে

হ্যারিকে দোষ দিতে পারলাম না সেজন্য, ওর দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকির আওয়াজ কানে আসছিল হালকা ভাবে।

'অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল এবার, ঘটল না কিছু। ভাবতে শুরু করলাম, সিংহীটা বোধহয় চলে গেছে। কিন্তু একটু পরেই আবারও দেখতে পেলাম ওটাকে, বিরাট এক লাফে সোজা গিয়ে ষাঁড়টার পিঠে পড়ল এবার সিংহী, প্রচণ্ড থাবড়া মারল ষাঁড়ের গর্দানে।

'হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল ষাঁড়টা, দুর্বল ভাবে পা ছুঁড়তে শুরু করল। কিন্তু তা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য, তারপরই হতভাগ্য ষাঁড়ের কণ্ঠনালীতে বসে গেল সিংহীর ধারাল শ্বদন্ত। তৃপ্তি প্রকাশ করতে ঘড়ঘড় আওয়াজ ছাড়ল ক্ষুধার্ত শ্বাপদ। আবার যখন সিংহী মুখ তুলল, দেখলাম রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে ওটার নাক। পাশ থেকে আমাদের দিকে তাকাল ওটা, জিভ বের করে রক্তাক্ত চোয়াল চাটবার ফাঁকে তৃপ্ত বিড়ালের মতো গর্‌র্‌র্‌-গর্‌র্‌র্‌ আওয়াজ করল।

'"সময় হয়েছে, হ্যারি," ফিসফিস করে বললাম, "আমি গুলি করলেই সঙ্গে সঙ্গে তুইও করবি।"

'সাবধানে লক্ষ্যস্থির করলাম। কিন্তু আমার অপেক্ষায় বসে নেই হ্যারি, কী বলেছি কানে তুলল না ও, গুলি করে বসল। বাধ্য হয়ে দেরি না করে গুলি করলাম আমিও। ধোঁয়ার মেঘ সরে যাবার পর মৃত ষাঁড়ের পিছনে সিংহীটাকে শরীর মোচড়াতে দেখে খুশি হয়ে উঠলাম। তবে ষাঁড়ের মৃতদেহের আড়াল পাচ্ছে বলে আবারও ওটাকে গুলি করে মৃত্যু নিশ্চিত করতে পারলাম না।

'খুশিতে চেঁচাল হ্যারি, "খতম হয়ে গেছে! মরে গেছে হলদে শয়তানীটা!" আর ঠিক তখনই ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডানদিকের ঘন ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল সিংহী। ওটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম, মনে হলো না লাগাতে পেরেছি। ঝোপের আড়ালে গিয়ে ভয়ঙ্কর গর্জন ছাড়তে শুরু করল নরখাদকটা। ওরকম গা শিউরানো গর্জন করতে আগে কখনও শুনিনি আমি কোনও শ্বাপদকে। কখনও কখনও ব্যথায় ককাচ্ছে ওটা, তার পরপরই চারপাশ থরথর করে কাঁপিয়ে গর্জে উঠছে।

'"গর্জাতে থাক," হ্যারিকে বললাম, "রাতের বেলা ওটার পিছু নিয়ে ঝোপে ঢোকা পাগলামি হবে।"

'আমার কথা শেষ হওয়ামাত্র বিস্ময়ের ধাক্কা খেলাম। নদীর দিক থেকে সিংহীর গর্জনের জবাব ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা সিংহ গর্জন করে উঠল ঝোপের ভিতর থেকে। বুঝতে আমার দেরি হলো না, কাছেই আছে একাধিক সিংহ। আহত সিংহীর তর্জন-গর্জন বেড়ে গেল। সঙ্গীদের সাহায্য কামনা করে ডাকছে বোধহয়। উদ্দেশ্য পূরণ হলো ওটার। শীঘ্রি এগিয়ে এলো অন্য সিংহগুলো। পাঁচ মিনিটের মাথায় কাঁটাঝোপের বেড়ার এপাশ থেকে উঁকি দিয়ে চমৎকার একটা পূর্ণবয়স্ক সিংহকে লাফিয়ে লাফিয়ে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম। চাঁদের আলোয় পাকা ভুট্টা-খেতের মতো লাগল ট্যামবাউকি

ঘাস, তার মধ্য দিয়ে এলো ওটা। বড় বড় লাফে সিংহটাকে ছুটে আসতে দেখবার দৃশ্যটা চিরদিন মনে থাকবে আমার। পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে ফাঁকা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠল ওটা। পাল্টা জবাব দিল সিংহী। গর্জন ছাড়ল তৃতীয় শ্বাপদ, তারপর দেখতে পেলাম রাজকীয় ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে কালো কেশরওয়ালা একটা সিংহ। ঘাসের মাঠে আগের সিংহটার পাশে থামল ওটা। হাড়ে হাড়ে টের পেলাম, মারা যাবার আগে অসুস্থ ষাঁড়টার মানসিক অবস্থা কেমন হয়েছিল।

'"আর যা-ই করিস, হ্যারি, ভুলেও গুলি করিস না," ফিসফিস করলাম। "বিরাট ঝুঁকি নিতে হবে তা হলে। ওরা যদি আমাদের কিছু না করে, তা হলে আমরাও কিছু করতে যাব না।"

'সিংহীর তর্জন-গর্জন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। পাশাপাশি হেঁটে ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকল জোড়া সিংহ। এবার শুরু হলো সম্মিলিত দাঁত খিঁচানো আর ঘড়ঘড় শব্দ। একটু পরে সিংহীর গর্জন থেমে গেল। সিংহ দুটো বেরিয়ে এলো ঝোপ থেকে। কালো কেশরওয়ালাটা আগে বের হয়ে হেঁটে গেল মৃত ষাঁড়ের কাছে, গন্ধ শুঁকল মড়ির গায়ে নাক ঠেকিয়ে।

'"এক গুলিতে ফেলে দিতে পারব!" উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বিড়বিড় করল হ্যারি।

'"পারবি, কিন্তু গুলি করিস না," সাবধান করলাম, "সবগুলো হামলা করে বসলে আমরা শেষ।"

'জবাব দিল না হ্যারি। জানি না কৈশোরের চিন্তাহীনতা, আকস্মিক উত্তেজনা, না স্রেফ বেপরোয়া শয়তানীতে পেয়ে বসল ওকে–পরে জিজ্ঞেস করে কখনও ওর কাছ থেকে সন্তোষজনক জবাব পাইনি–আমার কথায় বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে ওর ওয়েস্টলি রিচার্ডস রাইফেলটা তুলেই গুলি করল হ্যারি কালো কেশরওয়ালা সিংহটাকে লক্ষ্য করে। সিংহটার পিছনের একপাশ ভালরকম ছিলে দিয়ে গেল হ্যারির গুলি।

'সেকেন্ড পার হবার আগেই বিকট গর্জন করে উঠল আহত সিংহ, ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে শত্রুকে খুঁজবার ফাঁকে গর্জাতে থাকল ব্যথায়। আমি কী করব তা ঠিক করতে চেষ্টা করলাম। কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারার আগেই কার কারণে ব্যথা পেয়েছে সেটা আন্দাজ করে নিয়ে বাদামী কেশরওয়ালা সিংহটার গলা লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল কালো কেশরওয়ালা বিরাট সিংহ। বিনা কারণে আক্রান্ত সিংহের বিস্ময়টা হলো দেখবার মতো। রাগে দাঁত খিঁচিয়ে শরীর গড়িয়ে সরে যেতে চেষ্টা করল ওটা। কিন্তু ছাড়ল না কালো কেশরওয়ালা, লাফ দিয়ে পড়ল সঙ্গীর উপর। হলদে কেশরওয়ালা সিংহটা এতক্ষণে বুঝতে পারল, পরিস্থিতি আসলে কীরকম। কার্যকর প্রতিক্রিয়া দেখাতে দেরি করল না ওটা, কীভাবে যেন দাঁড়িয়ে পড়েই গর্জন ছাড়তে ছাড়তে পাল্টা ঝাঁপিয়ে পড়ল শক্তিশালী প্রতিপক্ষের উপর।

'অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখবার সুযোগ পেলাম আমরা। বড় দুটো কুকুরের লড়াই যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, কীরকম ভয়ঙ্কর হয় কুকুরের লড়াই। আমি

শপথ করে বলতে পারি, প্রকাণ্ড সিংহ দুটো যেভাবে মরণপণ লড়তে শুরু করল, তাতে একশোটা কুকুর একসঙ্গে লড়াই বাধালেও পরিস্থিতি ওরকম ভয়ঙ্কর হতো না। সামনের দু'পায়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে একে অপরের গলা কামড়ে ছিঁড়ে নিতে চাইল সিংহ দুটো, থাবা মারল শত্রুর শরীর চিরে দিতে। গোছা গোছা কেশর খসে পড়ল মাটিতে। হলদেটে চামড়া দিয়ে দরদর করে রক্ত গড়াতে লাগল। বিরাট দুটো শ্বাপদ তাদের সমস্ত হিংস্রতা আর শক্তি দিয়ে একে অপরকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাইছে। সিংহের গর্জনে রাতটা হয়ে উঠল আতঙ্কজনক। বুক ঢিবঢিব করতে লাগল আমাদের। রাজাদের লড়াই বোধহয় একেই বলে। কিছুক্ষণ বোঝা গেল না কে জিতবে–হলদে কেশর না কালো কেশর। তারপর খেয়াল করলাম, আকারে বড় হলেও মার বেশি খাচ্ছে কালো কেশরওয়ালা। হতে প্যারে গুলির আঘাতটা ওটাকে খানিকটা পঙ্গু করে ফেলেছে। আগে ওটাই আক্রমণ করেছে সঙ্গীকে, তারপরও ওটার জন্য দুঃখ হলো আমার। অসম সাহসিকতায় লড়ল কালো কেশরওয়ালা, কিন্তু তারপরও বাদামী কেশর শেষপর্যন্ত ওটার গলা কামড়ে ধরল। নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল কালো কেশর মাটিতে গড়িয়ে, থাবা মেরে, কিন্তু তারপরও কামড় ছাড়ল না বাদামী কেশর। ধীরে ধীরে প্রাণশক্তি হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগল বনের কালো রাজা। দুটো পূর্ণবয়স্ক সিংহ মাটিতে গড়াচ্ছে, পরস্পরকে আঘাত করছে প্রাণপণে–দৃশ্যটা শ্বাসরুদ্ধকর। একবারের জন্যও কালো কেশরের কণ্ঠা থেকে কামড় ছাড়ল না বাদামী কেশর। বেশ কিছুক্ষণ পর আরও নিস্তেজ হয়ে পড়ল কালো কেশর, অনিয়মিত শ্বাস নিতে শুরু করল, নাক দিয়ে খড়খড় আওয়াজ বের হলো ওটার। বিরাট মুখটা হাঁ করল বনের রাজা, বিকট এক গর্জন বের হলো ওটার গলা চিরে, তারপর একবার কেঁপেই নিথর হয়ে গেল একেবারে। বুঝলাম, প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে ওটার।

'লড়াইয়ে জিতে গেছে নিশ্চিত হয়ে কামড় ছাড়ল বাদামী কেশরওয়ালা সিংহ, শুঁকে দেখল মৃত শত্রুকে। এবার শত্রুর চোখগুলো চেটে নিয়ে সামনের পা দুটো তুলে দিল বিজিতর গায়ের উপর, তারপর ছাড়ল বিজয়ীর হুঙ্কার। রাতের আঁধার চিরে দূর হতে বহু দূরে প্রতিধ্বনি তুলে চলে গেল ওই আওয়াজ। বনের রাজাকে বিজয়োৎসব করতে বেশিক্ষণ সময় দিলাম না, সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্যস্থির করলাম ওটার বুকে, তারপর স্পর্শ করলাম ট্রিগার। .৫৭০ এক্সপ্রেস বুলেট বুকে আঘাত হানল, প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পরাজিত প্রতিপক্ষের লাশের উপর পড়ল বিজয়ী যোদ্ধার মৃতদেহ।

'সিংহ দুটো মারা যাওয়ায় খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে গেলাম হ্যারি আর আমি। বাকি রাত পাহারায় থাকল ফারাও, আবারও কোনও সিংহ চলে এলে আমাদের সতর্ক করবে।

'সূর্য উঠবার বেশ পরে ঘুম ভাঙল আমাদের। অনিচ্ছুক হ্যারিকে কাঁটাঝোপের বেড়ার মধ্যে বসিয়ে রেখে ফারাও আর আমি চললাম আহত সিংহীর কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখতে। সিংহ দুটো আসবার একটু পরে গর্জন থামিয়ে দিয়েছিল সিংহী, তারপর থেকে কোনও শব্দ পাইনি

আর ওটার, তারপরও সতর্ক থাকলাম দু'জনই। আমার হাতে এক্সপ্রেস রাইফেল, ফারাওয়ের হাতে রাইফেল থাকলে সেটা ওর সঙ্গীদের জন্য বিপজ্জনক, কাজেই ওর হাতে কুঠার। ঝোপের দিকে যাবার সময় মৃত সিংহ দুটোকে ভালমত দেখতে থামলাম। চমৎকার দুটো রাজকীয় পশু, কিন্তু থাবার আঘাতে পরস্পরের চামড়া একদম ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে,ওগুলোর আর কোনও দাম নেই।

'মৃত সিংহ দুটোকে দেখা শেষে আহত সিংহীর রেখে যাওয়া রক্তের দাগ অনুসরণ করে ঝোপের মধ্যে ঢুকলাম দু'জন, আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছি। এই ঝোপগুলোর ভিতরেই এসে লুকিয়েছিল সিংহী। ঝোপে ঢুকতে সায় পাচ্ছিলাম না মন থেকে, কিন্তু না ঢুকে উপায়ও নেই আসলে। সিংহী মরেছে কি না জানতে হলে ঢুকতেই হবে। তা ছাড়া, খুব ঘন ঝোপও নয় ওগুলো। ফারাও আর আমি গাছগুলোর কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চারপাশে দেখলাম। সিংহীকে দেখলাম না কোথাও। তবে চারপাশে অনেক জায়গায় রক্ত পড়ে রয়েছে।

"'নিশ্চয়ই মরবার জন্য কোথাও চলে গিয়েছে," শেষে বললাম ফারাওকে।

"'তা-ই হবে, ইনকূস," বলল ফারাও। "চলে গেছে তাতে সন্দেহ নেই।"

'ওর মুখের কথা শেষ হবার আগেই ঘাড়ের কাছে গর্জন শুনতে পেলাম। ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝোপের ঠিক মাঝখান থেকে ফারাওয়ের পিছনে বেরিয়ে আসতে দেখলাম সিংহীটাকে। পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে গেল আহত সিংহী। খেয়াল করলাম, ওটার সামনের একটা পা অকেজো হয়ে গেছে কাঁধে গুলি লেগে। অবশভাবে ঝুলছে পা-টা। দাঁড়িয়ে পড়ায় ফারাওয়ের মাথা ছাড়িয়ে গেল সিংহীর মাথা, ভাল পা তুলল ওটা ফারাওকে থাবার আঘাতে মাটিতে শুইয়ে দিতে। অতটুকু সময়ের মধ্যে রাইফেল ঘুরিয়ে কাঁধে তুলতে পারলাম না আমি, শুধু বুঝলাম, ফারাওয়ের আর রক্ষা নেই। নিজের বিপদ বুঝতে পারল দুঃসাহসী জুলুও, একইসঙ্গে সাহস আর বুদ্ধির একটা কাজ করে বসল ও, লাফ দিয়ে একপাশে সরেই কাঁধের জোরে ঘুরিয়ে চালাল ওর ভারী কুঠার। সিংহীর শিরদাঁড়ায় পড়ল কুঠারের জোরাল আঘাতটা। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল মেরুদণ্ডের হাড়। খালি একটা বিরাট বস্তার মতো ঝুপ করে মাটিতে পড়ল মৃত সিংহী। টের পেলাম, এতক্ষণে শ্বাস নিচ্ছি। কোনওমতে বললাম, "সাবাশ, ফারাও! একেবারে ঠিক সময়ে কুঠার চালিয়েছ! আরেকটু হলে..."

"'জী, ইনকূস," মৃদু হেসে বলল ফারাও। "ভাল ভাবে কুঠার চালিয়েছি আমি। জিম-জিম এখন শান্তিতে ঘুমাবে।"

'হ্যারিকে ডাক দিয়ে আনলাম আমরা ঝোপের ভেতর, তিনজন পরখ করে দেখলাম মৃত সিংহীকে। ক্ষয়ে যাওয়া গিজগিজে দাঁত দেখে বুঝতে পারলাম অনেক বয়স হয়েছিল ওটার। সাধারণত এতোদিন বাঁচে না কোনও সিংহী। সত্যিই অবাক হলাম ওটার প্রাণপ্রাচুর্য কতখানি ছিল তা অনুভব করে। আমার ছোঁড়া এক্সপ্রেস বুলেটের আঘাত কাঁধ তো ভেঙেছেই, হাতের মুঠো ঢুকে যাবার

মতো বড় ফুটোও তৈরি করেছে পেটে।'

গল্পের শেষে এসে নড়েচড়ে বসলেন অ্যালান কোয়াটারমেইন। 'জিম-জিমের মৃত্যুর প্রতিশোধ আমরা এভাবেই নিয়েছিলাম। আজও অবাক হয়ে যাই ওই সিংহ দুটোর মরণপণ লড়াইয়ের কথা ভাবলে। সিংহদের স্বভাবের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে ওরকম ভয়ঙ্কর লড়াই মোটেই মানায় না। আমার শিকারী জীবনে ওরকম ঘটনা আর কখনও দেখিনি।'

'তারপর পিলগ্রিম'স রেস্টে ফিরলেন কীভাবে?' মিস্টার কোয়াটারমেইন থেমে যাবার পর জিজ্ঞেস করলাম।

'কষ্ট হয়েছিল খুব,' বললেন তিনি। 'শেষপর্যন্ত তিনটে ষাঁড় বেঁচে ছিল। ওগুলোকে কার্ট টানতে দিয়ে পিছন থেকে ঠেলতাম আমরা। প্রতিদিন চার মাইলের বেশি পার হতে পারিনি ওভাবে। একমাস লেগেছিল পিলগ্রিম'স রেস্টে পৌঁছতে। শেষ এক সপ্তাহ প্রায় অনাহারে কেটেছিল।'

'একটা কথা না বললেই নয়,' আমি বললাম, 'আপনার বেশিরভাগ অভিযানের শেষেই দেখা যায় কোনও না কোনও বিপর্যয় ঘটে। তারপরও একের পর এক অভিযানে যেতে কখনও দ্বিধা করেন না আপনি। ...কারণটা কী?'

'বিপদ ঘটে, এ-কথা সত্যি,' স্বীকার করে নেবার সুরে বললেন বিখ্যাত শিকারীটি, 'কিন্তু এটাও তো ঠিক যে শিকার করেই আমি জীবিকার জোগাড় করেছি প্রায় সারাটা জীবন? বিপদের মধ্যে মজাও থাকে। আর, আমার সব অভিযানেই বিপর্যয় ঘটেছে তা কিন্তু নয়। পরে কখনও যদি শুনতে চান, তা হলে এমন একটা অভিযানের কথা বলব, যেখানে সর্বক্ষণ আমার সাথী ছিল সৌভাগ্য। ওই অভিযান থেকে কয়েক হাজার পাউন্ড লাভ করেছিলাম, সেইসঙ্গে দেখেছিলাম আমার শিকারী জীবনে দেখা অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য। ওই অভিযানেই আমার পরিচয় হয়েছিল আফ্রিকার সাহসীতমা নারী মাইওয়ার সঙ্গে। যাক, ও নিয়ে এখন আর কিছু বলব না, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে অনেক। তা ছাড়া, নিজের কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ...পানির গ্লাসটা একটু এগিয়ে দিন দেখি!'

লং অড্‌স্‌

সেটাই ছিল ইংল্যান্ডে স্যার হেনরি কার্টিস, ক্যাপ্টেন গুড ও মিস্টার কোয়াটারমেইনের শেষ রাত, পরদিন সকালে জাহাজ যোগে আফ্রিকার উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবেন তাঁরা। নতুন এক রহস্যময় দেশের খোঁজে আফ্রিকায় যাচ্ছিলেন তিন অভিযাত্রী। শুনেছিলাম সুদূর সেই দুর্গম দেশে রাজত্ব করে আজব একদল সাদামানুষ।

অনেকদিন পেরিয়ে গেছে তার পরে। সেই অভিযান থেকে আজও ফেরেননি তিন অভিযাত্রী। ভাবতে খারাপ লাগলেও ধারণা করছি, ফিরবেনও না কখনও আর। মাঝখানে তাঁদের খবরাখবর জানিয়ে একটা চিঠি এসেছিল পূব আফ্রিকা থেকে, তারপর বছর গড়িয়ে গেছে, সভ্য জগতের কারও সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ হয়নি তাঁদের। জানি না আজও তাঁরা বেঁচে আছেন কি না। তবে মনে পড়ে তাঁদের কথা, বিশেষ করে ক্যাপ্টেন গুড আর মিস্টার কোয়াটারমেইনের স্মৃতি।

মিস্টার কোয়াটারমেইনের বাড়িতে প্রায়ই উপস্থিত হতাম তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা শুনবার লোভে।

ইংল্যান্ডে তাঁদের শেষ রাতে মিস্টার কোয়াটারমেইনের ইয়র্কশায়ারের বাড়িতে ক্যাপ্টেন গুড-এর সঙ্গে ডিনারে উপস্থিত ছিলাম আমিও। সে-রাতটা ছিল ব্যতিক্রম। ক্যাপ্টেন গুড ও আমাকে সঙ্গ দিতে গিয়ে স্বভাবের বিরুদ্ধে কয়েক গাস পর্ট ওয়াইন গিলে ফেলেছিলেন মিস্টার কোয়াটারমেইন। নেশা ভালমতই ধরেছিল তাঁকে, ফলে ডিনারের পর দেয়ালে ঝোলানো শিকারের ট্রফিগুলোর পাশ দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পায়চারি করছিলেন তিনি, স্বাভাবিক অবস্থায় নিজের অভিজ্ঞতার কথা কদাচ বলতে চাইলেও সে-রাতে মুখ খানিকটা আলগা হয়ে গিয়েছিল তাঁর।

ম্যান্টলপিসে সাজানো রাইফেলগুলোর উপর ঝোলানো সিংহের বিরাট একটা মাথার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন মিস্টার কোয়াটারমেইন, 'শয়তান সিংহ! গত বারোটা বছর কষ্ট দিচ্ছিস তুই আমাকে! মনে হয় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কষ্ট দিবি!'

এখানে বলে রাখা ভাল, মিস্টার কোয়াটারমেইনের সংগ্রহ করা প্রতিটা ট্রফির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোনও না কোনও চমকপ্রদ কাহিনি, কাজেই সিংহের ট্রফিটার ব্যাপারে জানতে উসখুস করে উঠেছিলাম আমি।

'কী হয়েছিল বলুন না, কোয়াটারমেইন,' গল্পের আভাস পেয়ে অনুরোধের সুরে বলেছিলেন গুড। 'অনেকবার বলেছেন ঘটনাটা বলবেন আমাকে, কিন্তু বলেননি শেষপর্যন্ত কখনও।'

'শুনতে চাইলে ঠকবেন কিন্তু,' সাবধান করেছিলেন মিস্টার কোয়াটারমেইন,

এ এক লম্বা কাহিনি।'

'তাতে কী,' সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না আমি, 'মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। তা ছাড়া, অনেকখানি পর্ট রয়ে গেছে বোতলে।'

আমাদের কথা শুনে ম্যান্টেলপিসের উপর রাখা একটা জার থেকে বুয়ার টোবাকো বের করে পাইপে পুরলেন মিস্টার কোয়াটারমেইন, পায়চারি না থামিয়ে শুরু করলেন তাঁর কাহিনি–

'যতদূর মনে পড়ে, সেটা ছিল উনষাটের মার্চ মাস। গিয়েছিলাম সিকুকুনির এলাকায়। কিছুদিন আগেই মারা গেছে বুড়ো সেকুয়াটি, চক্রান্ত করে শেষপর্যন্ত ক্ষমতায় বসেছে সিকুকুনি। কয়েকদিন ওখানে কাটানোর পর কানে এলো, বাপেডি উপজাতির লোকরা উত্তরের অঞ্চল থেকে প্রচুর হাতির দাঁত সংগ্রহ করে এনেছে। দেরি না করে ওয়্যাগনে মালামাল ভরে রওনা হয়ে গেলাম আমি মিডেলবার্গ থেকে। উদ্দেশ্য, মালামালের বদলে বাপেডিদের কাছ থেকে হাতির দাঁত সংগ্রহ করা। বছরের ওই সময়টায় আফ্রিকার গভীরে যাওয়া খুব বিপজ্জনক। যে-কোনও সময় ধরতে পারে ভয়ঙ্কর জ্বর। কিন্তু, না গিয়ে উপায় ছিল না। আরও কয়েকজনের চোখ ছিল ওই হাতির দাঁতগুলোর উপর। ওগুলো পাবার বদলে জ্বরে পড়বার ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করিনি। বারবার জ্বরে পড়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, পাত্তা দিতাম না আর অসুস্থতাকে।

'পথে কয়েকদিন কোনও অসুবিধে হলো না। ওই এলাকাটা ঝোপের রাজ্য, অপূর্ব সুন্দর। মাঝখান দিয়ে গেছে আকাশছোঁয়া বিশাল পর্বতের সারি, ঝোপে ঢাকা বিস্তৃত জমি পাহারা দিচ্ছে যেন মাথা তুলে। ওদিকটায় বছরের ওই সময়ে গরম ছিল খুব, সেইসঙ্গে চারদিকে চলছিল জ্বরের প্রকোপ। ওলিফ্যান্ট নদীর তীর ধরে এগোতে গিয়ে প্রতি সকালে ওয়্যাগন থেকে নেমে তাকাতাম ওলিফ্যান্টের দিকে। নদী দেখা যেত না সূক্ষ্ম তুলোর মতো থোকা থোকা কুয়াশায়। ওই কুয়াশাকে ওদিকে বলা হয় জ্বরের কুয়াশা। নদী তীরের ঝোপগুলো থেকে উঠত ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো বাষ্প। ওগুলো ছিল হাজার হাজার টন পচা লতা-পাতার বাষ্প। সুন্দর একটা অঞ্চল, কিন্তু বছরের ওই সময়ে জ্বরে ভুগে মৃত্যু ছিল ওখানে স্বাভাবিক ঘটনা।

'সে-বছর রোগে ভুগে মরেছিল হাজার হাজার মানুষ। মনে পড়ে, একবার ছোট একটা ক্রালে গিয়েছিলাম রান্না করা কচি ভুট্টার দানা, মাখন আর দুধের আশায়। ক্রালের কাছে যাবার পর খেয়াল করলাম, আশপাশ অস্বাভাবিক রকম নীরব–বাচ্চাদের কোলাহল নেই, চিৎকার করল না কোনও কুকুর। গরু-ভেড়ার দেখাও পেলাম না। ক্রাল ঘিরে এগিয়ে আসা ঝোপঝাড় দেখে মনে হলো বেশ কয়েকদিন ওই ক্রালে বাস করেনি কেউ। ক্রালের দরজায় জন্মানো প্রিকলি পেয়ার ঝোপ থেকে আমাকে দেখে ছুটে পালাল কয়েকটা গিনি ফাওল।

'পরিবেশটা চারপাশে এত থমথমে যে দ্বিধা করলাম ক্রালে ঢুকতে। ঢুকলাম তারপরও, চলে এলাম প্রধান কুটিরের সামনে। মাটিতে কী যেন পড়ে আছে দেখলাম, ভেড়ার চামড়ার পুরোনো একটা আলখেল্লা দিয়ে ঢাকা। উবু হয়ে

সরালাম আলখেলাটা, পরক্ষণে চমকে পিছিয়ে গেলাম। ঢেকে রাখা হয়েছিল সদ্যমৃত এক তরুণীকে। একবার ভাবলাম ফিরে যাই, কিন্তু কৌতূহল আমাকে ফিরতে দিল না। মৃত মেয়েটাকে পাশ কাটিয়ে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলাম কুটিরে। ভিতরটা এতো অন্ধকার যে দেখতে পেলাম না কিছু। তবে দুর্গন্ধ বলে দিল বহু কথা। ম্যাচের কাঠি জ্বাললাম। ট্যান্ডস্টিকর ম্যাচ বলে কাঠি পুড়তে শুরু করল ধীরে ধীরে, স্বল্প আলো ছড়িয়ে। সেই আলোতে চোখ সয়ে আসবার পর আন্দাজ করলাম, কুটিরে আমি একটা পরিবারকে দেখছি। পুরুষ, নারী ও বাচ্চারা গভীর ভাবে ঘুমাচ্ছে। কাঠিটা আরও জোরেশোরে জ্বলে উঠবার পর বুঝলাম, এরা পাঁচজনও মারা গেছে। কচি শিশুও ছিল তাদের মধ্যে। ম্যাচের কাঠি ফেলে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যেতে চাইলাম কুটির থেকে। ঠিক তখনই চকচকে দুটো চোখ দেখতে পেলাম এক কোনায়। ওগুলো কোনও বুনো বিড়ালের চোখ মনে করে তাড়াহুড়ো আরও বেড়ে গেল আমার। চোখগুলোর কাছ থেকে বিড়বিড় করে কী যেন বলল কেউ, তারপর দফায় দফায় চিৎকার শুরু করল।

'তাড়াতাড়ি আরেকটা কাঠি জ্বেলে দেখলাম চোখ দুটো আসলে নোংরা চামড়ার চাদর গায়ে এক বৃদ্ধার। হয় বৃদ্ধা কুটির থেকে বের হতে পারছিল না, অথবা বের হবার কোনও ইচ্ছে ছিল না তার, কনুই ধরে টানতে টানতে তাকে বের করলাম কুটির থেকে। ভেতরের দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার। দিনের আলোয় বৃদ্ধাকে দেখে বিস্মিত হলাম। ঠিক যেন কুঁচকানো চামড়া দিয়ে মোড়ানো একটা কঙ্কাল। চোখের দৃষ্টি আর কণ্ঠস্বরের কথা বাদ দিলে মনে হচ্ছিল মারাই গিয়েছে বৃদ্ধা। আমাকে দেখে তার ধারণা হয়েছিল, আমি আসলে শয়তান, তাকে নরকে নিয়ে যেতে হাজির হয়েছি, সেই ভয়েই চেঁচিয়ে উঠেছিল। যা-ই হোক, তাকে ধরে ধরে ওয়্যাগনের কাছে নিয়ে এলাম, সামান্য হুইস্কি গিলিয়ে দিলাম। রান্না হতেই জোর করে গিলতে বাধ্য করলাম এক পাইন্ট বিফ-টি। ওই মাংস জোগাড় করেছিলাম তার আগের দিন একটা উইল্ডারবিস্ট শিকার করে। বিফ-টি শেষ করে বেশ তাজা হয়ে উঠল বৃদ্ধা। জানা গেল জুলু ভাষাটা জানে সে। রাজা চাকার সময় জুলুল্যান্ড থেকে পালিয়ে এসেছিল বৃদ্ধা। আরও জানাল, জ্বরে মারা গেছে কুটিরের সবাই। তারা মারা যাবার পর ক্রালের আর সবাই গবাদি পশুগুলো নিয়ে চলে গেছে বেচারিকে ফেলে। নড়তে চড়তে অক্ষম বৃদ্ধাকে অনাহারে বা রোগে মরতে রেখে গেছে। ওই কুটিরে পচা লাশগুলোর সঙ্গে তিনদিন ছিল সে আমি গিয়ে উদ্ধার করে আনবার আগে। রওনা হলাম আমরা আবার। পরবর্তী ক্রালে পৌঁছে বৃদ্ধার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলাম ক্রালের হেডম্যানকে। বৃদ্ধাকে দেখভাল করবার বদলে দরাদরি করে একটা কম্বল পেল সে। তাকে কথা দিলাম, ফিরতি পথে বৃদ্ধাকে যদি সুস্থ দেখি, তা হলে আরেকটা কম্বল দেব। ভীষণ অবাক হলো লোকটা অশীতিপর বৃদ্ধার জন্য দু'দুটো কম্বল দিয়ে দিতে রাজি হয়েছি বলে। জিজ্ঞেস করল, কেন আমি বৃদ্ধাকে ঝোপের মধ্যে মরতে ফেলে আসিনি। আসলে কোনও মানুষ কাজ করতে না পারলে তার বাঁচবার অধিকার আছে বলে ধরা হয় না আফ্রিকার ওদিকে।

'বৃদ্ধাকে রেখে আসবার পরের রাতে প্রথমবারের মতো দেখা হলো আমার ওই বন্ধুর সঙ্গে,' মাথা কাত করে সিংহের করোটি দেখালেন মিস্টার কোয়াটারমেইন। মনে হচ্ছিল ম্যান্টেলপিসের উপরের ছায়াময় জায়গাটা থেকে দাঁত বের করে হাসছে সিংহটা। 'সেদিন ভোর থেকে সকাল এগারোটা পর্যন্ত একটানা এগিয়েছি, পাড়ি দিয়েছি লম্বা পথ, তারপরও ভাবলাম সন্ধ্যা ছ'টার দিকে আবার রওনা হয়ে চাঁদের আলোয় আরও এগোব। আমার নির্দেশে বিশ্রাম নিতে ছেড়ে দেয়া হলো ষাঁড়গুলোকে। এই ফাঁকে পেটপুরে ঘাস খেতে পারবে। ওগুলোর উপর নজর রাখতে গেল ভূরলূপার। ওয়্যাগনে উঠে টেনে ঘুম দিলাম। ঘুম ভাঙল দুপুর আড়াইটার দিকে। খানিকটা বিস্বাদ মাংস রেঁধে দুপুরের খাবার গিললাম কড়া কফি দিয়ে। খাওয়া শেষে বাসন-কোসন ধুতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওয়্যাগনের ড্রাইভার টম। আর ঠিক তখনই সামনে একটা ষাঁড় তাড়িয়ে ছুটতে ছুটতে এলো বেয়াড়া তরুণ রাখাল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "অন্য ষাঁড়গুলো কোথায়?"

"'কূস!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ছোকরা, "কূস! অন্যগুলো পালিয়েছে। মাত্র এক পলকের জন্য ওগুলোর দিকে পিঠ ফিরিয়েছি, তার পরে তাকিয়ে দেখি শুধু এই *ক্যাপ্টেন* আছে, গাছের গায়ে পিঠ ডলছে।"

"'তার মানে, তুমি শয়তান ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আর সেই সুযোগে ছড়িয়ে পড়েছে ওগুলো," রেগে গিয়ে বললাম। "তোমার পিঠে আচ্ছামত গিঁঠওয়ালা লাঠি ডলব আমি।" রাগবার কারণও ছিল আমার, ওই জ্বরের এলাকায় ষাঁড়গুলোকে খুঁজে বের করতে গিয়ে এক সপ্তাহের বেশিও লাগতে পারে, জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারি আমরা। নির্দেশ দিলাম, "খুঁজতে যাও এক্ষুনি। টম, তুমিও যাও। ষাঁড়গুলোকে না নিয়ে ফিরবে না খবরদার। এতক্ষণে মিডলবার্গের রাস্তা ধরে অন্তত বারো মাইল চলে গেছে ওগুলো। রওনা হয়ে যাও তোমরাও। কোনও তর্ক শুনব না।"

'এ-কথা শুনে রেগে গিয়ে গালাগালির ফাঁকে তরুণ রাখালের পাছায় গদাম করে একটা লাথি মারল ওয়্যাগনের ড্রাইভার টম। শয়তানটার প্রাপ্য ছিল ওই লাথি। ক্যাপ্টেন নামের ষাঁড়টাকে ওয়্যাগনের জোয়ালের সঙ্গে বেঁধে বর্শা আর লাঠি হাতে এরপর রওনা হয়ে গেল ওরা। আমিও যেতাম, গেলাম না, কারণ ওয়্যাগনের ধারেকাছে কারও না কারও থাকা দরকার।

'ষাঁড় হারানোর মত অঘটন আফ্রিকায় প্রায়ই ঘটে, তারপরও খিঁচড়ে গেল মেজাজটা। রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম শিকার করতে। ঘণ্টা দুয়েক ঘুরেও গুলি করবার মতো কিছুর দেখা পেলাম না। ফিরতি পথ ধরে ওয়্যাগনের সত্তর গজের মধ্যে পৌঁছে গিয়ে একটা মিমোসা গাছের পিছনে দেখতে পেলাম মর্দা ইমাপালাটাকে। আমাকে দেখেই সোজা ওয়্যাগনের দিকে দৌড় দিল ওটা। ওয়্যাগনটা পাশ কাটাচ্ছে, এমন সময় ভালমত দেখতে পেলাম। ট্রিগার টিপলাম দেরি না করে। মেরুদণ্ডের মাঝখানে লাগল বুলেট। ছিটকে পড়ে গেল মৃত ইমপালা। ওটা পড়েছে ওয়্যাগনের পিছনের দিকে। মেজাজটা খানিক ভাল হলো আমার। পেট চিরে ওটার নাড়িভুঁড়ি বের করে পা বেঁধে ওয়্যাগনে তুলতে

পরিশ্রম হবে না বেশি। কাজটা যখন শেষ করতে পারলাম, সূর্য ডুবে গেছে ততক্ষণে, আকাশে উঠেছে অপূর্ব সুন্দর রূপালী একটা পূর্ণিমার চাঁদ। চারদিকে নেমেছে আফ্রিকার ঝোপাঞ্চলের সন্ধ্যাকালীন থমথমে নীরবতা। নড়ছে না কোনও জন্তু, ডাকছে না কোনও পাখি, নিথর গাছগুলোতে শিরশির করে বয়ে যাচ্ছে না সামান্যতম হাওয়া। ছায়াগুলোও নড়ছে না, দৈর্ঘ্যে বাড়ছে ধীরে ধীরে। ভীতিকর একটা পরিবেশ। ভীষণ একা লাগল। কৃতজ্ঞ বোধ করলাম জোয়ালে বাঁধা বুড়ো ক্যাপ্টেনের সঙ্গ পেয়ে। জোয়ালের পাশে আরাম করে বসে খুশিমনে জাবর কাটছে ক্যাপ্টেন।

'একটু পর খেয়াল করলাম, অস্থির হয়ে উঠেছে বুড়ো ষাঁড়। প্রথমে নাক ঝাড়ল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বারবার নাক ঝাড়তে লাগল বিচলিত হয়ে। কারণ না বুঝে বোকার মতো ওয়্যাগন-বক্স থেকে নেমে কী হয়েছে দেখতে গেলাম। মনে হচ্ছিল হারানো ষাঁড়গুলো নিয়ে ফিরে আসছে টম আর রাখাল।

'পরমুহূর্তে গর্জনটা শুনে বুঝতে পারলাম, ভুল করে ফেলেছি। হলদে একটা ঝিলিক আমাকে পাশ কাটিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল বেচারা ক্যাপ্টেনের উপর। ব্যথায় ডাক ছাড়ল ক্যাপ্টেন। হাড় ভাঙবার আওয়াজ শুনতে পেলাম। সিংহটা কামড় বসিয়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেনের ঘাড়ে। কী ঘটছে তা এতক্ষণে মাথায় ঢুকল আমার। রাইফেলটা রয়ে গেছে ওয়্যাগনে। ওটা আনবার চিন্তাটা এলো প্রথমে, ঘুরেই দৌড় দিলাম ওয়্যাগন বক্সের দিকে। চাকার উপর পা রেখে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওয়্যাগনের ভেতরে। মেঝেতে বুক দিয়ে পড়ে বরফের মতো জমে গেলাম যেন। উঠবার সাহস পেলাম না। নড়তে পারলাম না। স্পষ্ট শুনেছি আমি সিংহটার নড়াচড়ার শব্দ। মুহূর্ত পরে ওটার স্পর্শ টের পেলাম। ওয়্যাগন থেকে আমার বাঁ পা ঝুলছে, নাক ঠেকিয়ে পা-টা শুঁকল সিংহ।

'খোদা! কেমন যে লাগছিল তা ভাষায় বোঝাতে পারব না। মনে হয় না কখনও ওরকম বিহ্বল হয়েছি জীবনে। নড়তে পারছি না মারা পড়বার ভয়ে, ওদিকে নিয়ন্ত্রণ হারালাম বাম পায়ের উপর থেকে, মনে হলো নিজের ইচ্ছায় লাথি ছুঁড়তে চাইছে পা-টা। পা শুঁকেই চলেছে সিংহ। গোড়ালি থেকে শুঁকতে শুঁকতে উরুর দিকে উঠছে ধীরে ধীরে। মনে হলো কামড় দেবে যখন-তখন, কিন্তু দিল না। ঘড়ঘড় করে নরম গর্জন ছেড়ে আবার ফিরে গেল হতভাগ্য ষাঁড়ের কাছে। তিল তিল করে মাথাটা একটু ঘুরিয়ে দেখলাম সিংহটাকে। জীবনে বহু সিংহ দেখেছি, কিন্তু অতবড় সিংহ আগে কখনও চোখে পড়েনি। কালো কেশরগুলো যেন ঘন ঝোপ। শ্বাপদটার দাঁতগুলো কেমন ছিল তা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। বিরাট, কি বলেন? ওয়্যাগনের মেঝেতে পড়ে আছি আমি, আর পিছনে মুক্ত সিংহ–মনে হলো ওটা কোনও খাঁচায় থাকলে দেখতে অনেক বেশি ভাল লাগত। বেচারা ক্যাপ্টেনের মড়িটাকে কসাইদের মতো দক্ষতায় টুকরো টুকরো করল সিংহটা। পুরোটা সময় পড়ে থাকলাম নিথর হয়ে। মাঝে মাঝে মাথা তুলে আমাকে দেখছিল আর জিভ দিয়ে রক্তাক্ত চোয়াল চাটছিল ওই শয়তান। তারপর ক্যাপ্টেনের মরদেহ ছিন্নভিন্ন করা শেষে গর্জন করে উঠল। বাড়িয়ে বলছি না, ওই গর্জনের আওয়াজে থরথর করে কাঁপল

ওয়্যাগনটা। গর্জন মিলিয়ে যেতে না যেতেই পাল্টা গর্জনে জবাব দিল আরেকটা শ্বাপদ।

'বুঝতে পারলাম, একটার বেশি আছে এদিকে। দমে গেলাম আরও।

'চাঁদের আলোয় লম্বা ঘাসের মাঝ দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসতে দেখলাম সিংহীটাকে। ওটার পিছনে এলো ম্যাস্টিফ কুকুরের সমান বড় দুটো শাবক। আমার মাথা যেখানে আছে, তার কয়েক ফুট দূরে থেমে লেজ নাড়তে নাড়তে জ্বলজ্বলে হলদে চোখে আমাকে দেখল সিংহী। মনে হলো এবার আর রক্ষা নেই। কিন্তু সরে গিয়ে মৃত ষাঁড়ের মাংস খেতে শুরু করল ওটা। শাবকগুলোও যোগ দিল। ভাবুন একবার, আমার আট ফুট দূরে খাওয়ার ফাঁকে ঘড়ঘড় করছে চারটে সিংহ, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে, কুড়মুড় করে ভেঙে খাচ্ছে দুর্ভাগা ষাঁড়ের মড়ি, আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তা দেখছি আমি। ঘেমে গোসল হয়ে গেলাম। একটু পর বাচ্চাগুলোর খাওয়া শেষ হলো, অস্থির হয়ে উঠল ওগুলো। ওয়্যাগনের পিছনে চলে গিয়ে ইমপালাটাকে টেনে নামাতে চাইল একটা, আরেকটা এসে আমার পা শুঁকে দেখার পুরোনো খেলা শুরু করল। তার বেশিই করল ওটা, আমার প্যান্ট উপরের দিকে উঠে যাওয়ায় রুক্ষ জিভ দিয়ে পা চেটে দেখল। যত চাটল, তত ভাল লাগল বোধহয় ওটার, কারণ চাটার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে মৃদু ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে শুরু করল। বুঝতে পারলাম, সময় শেষ হয়ে আসছে আমার। পায়ের চামড়া যত শক্তই হোক, ওই রুক্ষ জিভের ঘষায় ছিলে গিয়ে রক্ত বের হবে, আর রক্ত বের হলে বাঁচবার কোনও সুযোগ পাব না আমি। চুপচাপ পড়ে থেকে জীবনে কী কী পাপ করেছি তা ভাবতে লাগলাম, স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করলাম, সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলাম, জীবনটা সত্যিই খুব উপভোগ্য ছিল।

'কয়েক সেকেন্ড পর ঝোপঝাড় ভাঙবার আওয়াজ শুনতে পেলাম, সেইসঙ্গে মানুষের গলা। ষাঁড়গুলো নিয়ে ফিরছে ড্রাইভার টম ও রাখাল। আওয়াজ পেয়ে মাথা উঁচু করে শুনল সিংহগুলো, তারপর নিঃশব্দে কয়েক লাফে অদৃশ্য হলো ঘাসের বনে। জ্ঞান হারালাম আমি।

'সে-রাতে আর ফিরল না সিংহের পাল। পরদিন সকাল হতে হতে উত্তেজিত স্নায়ু শান্ত হলো আমার। তবে রাগে গা জ্বলছিল তখন সিংহদের হাতে–বলা উচিত জিভে–কীরকম হেনস্থা হয়েছি ভেবে। ক্যাপ্টেনের মৃত্যুর জ্বালা তো ছিলই। ষাঁড় হিসেবে খুব ভাল ছিল ও, ওকে পছন্দ করতাম। রাগে এতো অন্ধ হয়ে গেলাম যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, সিংহ পরিবারটাকে গুলি করে মারব। জীবনের প্রথম শিকার অভিযানে বেরিয়ে নতুন কোনও শিকারী এধরনের পরিকল্পনা করলে হয়তো মানাত, কিন্তু মাথা তখন গরম হয়ে আছে আমার। নাস্তার পর সিংহ শাবকদের চাটা ব্যথাভরা পায়ে তেল মালিশ শেষে অনিচ্ছুক টমকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম। সঙ্গে নিলাম আমার প্রথম ব্রিচলোডার, বারো বোরের সাধারণ একটা দোনলা বন্দুক। ওটা নিলাম বুলেট ভাল ছোঁড়ে বলে, তা ছাড়া, আমার অভিজ্ঞতা বলে এক্সপ্রেস রাইফেলের বুলেটের চেয়ে বন্দুকের গোল বুলেট সিংহ মারতে মোটেই কম কার্যকর নয়।

শরীরে ভারী ক্যালিবারের বুলেট বেঁধাতে পারলে সিংহ মারা সোজা। সে-তুলনায় হরিণ মারা অনেক কঠিন।

'রওনা হয়ে প্রথমেই খুঁজে বের করতে চাইলাম দিনের বেলায় সিংহগুলোর বিশ্রামের জায়গাটা। ওয়্যাগন থেকে তিনশো গজ দূরে আছে একটা ঢাল, ওটার মাথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মেছে মিমোসা গাছ। জায়গাটা পার্কের মতো। ঢাল থেকে নেমে গেছে ফাঁকা জমি, মিশেছে গিয়ে শুকনো একটা ডোবায়। ঘন নলখাগড়ায় ভরা ডোবাটা অন্তত এক একর জায়গা জুড়ে রয়েছে। হলদে হয়ে গেছে নলখাগড়ার পাতা। ডোবার ওদিকের পাড় থেকে গভীর একটা খাদের গায়ে মিশেছে জমি। পানির প্রবাহে তৈরি হয়েছে ওই খাদ। ভিতরে জন্মেছে ঘন ঝোপঝাড়, নলখাগড়া। ওগুলোর মাঝখানে বড় বড় কয়েকটা গাছ।

'জায়গাটা দেখেই মন বলল, ওখানেই থাকবে আমার রাতের বন্ধুরা। নলখাগড়ার জঙ্গলে বিশ্রাম নিতে পছন্দ করে সিংহ। ওখানে নিজেকে লুকিয়ে চারপাশে নজর রাখা সহজ। এগিয়ে গেলাম ডোবার দিকে। ওটা ঘুরে অর্ধেকটা যেতেই তিন-চারদিন আগে মারা পড়া একটা উইল্ডারবিস্টের অবশিষ্টাংশ দেখতে পেলাম। বুঝতে দেরি হলো না, ডোবার ধারেকাছে যদি সিংহ পরিবারের আস্তানা না-ও থাকে, অবসরের প্রচুর সময় কাটায় তারা এখানে। প্রশ্ন দেখা দিল, যদি তারা ডোবায় থেকে থাকে, তা হলে তাদের বের করে আনব কীভাবে। আত্মহত্যা করতে না চাইলে সিংহের খোঁজে নলখাগড়ার জঙ্গলে ঢোকা মোটেই ঠিক হবে না। ওয়্যাগনের দিক থেকে জংলা ডোবা ও খাদের দিকে বইছে একটানা জোরাল হাওয়া। ভাবলাম, দিই শুকনো নলখাগড়ার জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে। চিন্তাটা করতে যা দেরি, আমার নির্দেশে ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ডোবার বামদিকে এখানে-ওখানে ছোট-ছোট আগুন ধরিয়ে ফেলল টম। একই কাজ করলাম আমি ডোবার ডানদিকে। নলখাগড়ার গোড়া তখনও সবুজ রয়ে গেছে। বাতাসের সহায়তা না পেলে ওগুলোতে ভালমত আগুন ধরাতে পারতাম না আমরা। হাওয়ার ধাওয়া খেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল আগুনের দেয়াল। সিংহের মুখোমুখি হতে আমি চলে গেলাম ডোবার অন্যপাশে, অপেক্ষায় থাকলাম ওখানে। কাজটা বিপজ্জনক, কিন্তু তখন লক্ষ্যভেদে নিজের দক্ষতার উপর অতিরিক্ত আস্থা ছিল আমার। ডোবার ওদিকটায় গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে নলখাগড়ার জঙ্গলের দিক থেকে ছুটে আসতে শুনলাম কোনও প্রাণীকে। তৈরি হয়ে গেলাম বন্দুক কাঁধে তুলে। জানোয়ারটার হলুদ চামড়া দেখতে পেলাম, তার পরপরই সিংহের বদলে ছিটকে বেরিয়ে এলো অপূর্ব সুন্দর একটা রিটবক। নলখাগড়ার জঙ্গলে বিশ্রাম নিচ্ছিল হরিণটা। কেন যে ওটা সিংহগুলোর অতো কাছে বিশ্রামের জায়গা বেছে নিয়েছিল, তা বুঝলাম না। তবে ঘন নলখাগড়া হয়তো যথেষ্ট আড়াল দিচ্ছিল, অনেকখানি দূরে সরে ছিল ওটা।

'হরিণটাকে যেতে দিলাম। বিদ্যুতের গতিতে যেন হাওয়ায় ভেসে বিদায় নিল ওটা। চোখ সরালাম না নলখাগড়ার বন থেকে। দাউ-দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে আগুন, কড়-কড় শব্দে পোড়াচ্ছে নলখাগড়াগুলোকে। মাঝে মাঝে

বিশফুট উঁচু কমলা আগুনের হলকা লকলক করে চেটে দিচ্ছে আকাশের গা। কখনও কখনও চোখের সামনের দৃশ্যগুলোকে থরথর করে কাঁপিয়ে দিচ্ছে তপ্ত বাতাস। আধা-কাঁচা নলখাগড়া পুড়ে তৈরি হচ্ছে ঘন ধোঁয়ার বিশাল কালো মেঘ। বাতাসের তাড়া খেয়ে সরাসরি আমার দিকেই ধেয়ে এলো ওই গাঢ় মেঘ। আগুনের গর্জনের উপর দিয়ে শুনতে পেলাম আরেকটা বিস্মিত গর্জন। তারপর আরও কয়েকটা। বুঝতে দেরি হলো না, সিংহরা নলখাগড়া বনেই আছে।

'উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। উত্তেজনা আরও বাড়ল, যখন সিংহগুলোকে নলখাগড়া বন থেকে বেরিয়ে আমার দিকেই আসতে দেখলাম। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করছে ওগুলো, তখন দেখা যাচ্ছে। ঠিক যেন গর্ত থেকে মাথা বের করা খরগোশ আমাকে দেখে আবার জঙলা জায়গায় ঢুকে গেল সিংহগুলো। কিন্তু পিছনে আগুনের তাপ, বেশিক্ষণ ওখানে থাকবার উপায় নেই ওগুলোর। ধারণা ভুল হলো না আমার, হঠাৎ একযোগে দৌড়ে বেরিয়ে এলো চারটে সিংহ। সবার আগে ছুটছে কালো কেশরওয়ালা দলনেতা। শিকারী জীবনে কখনও ওরকম অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য দেখিনি আর। পিছনে নলখাগড়ার জঙ্গলে কমলা আগুন ও ঘন ধোঁয়ার পটভূমি। লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসছে চারটে সিংহ। অপূর্ব।

'ধারণা করলাম, আমার পাঁচ থেকে বিশ ফুট দূরত্ব দিয়ে খাদের মধ্যে গিয়ে ঢুকবে সিংহগুলো। দেরি না করে অস্ত্র তুললাম কালো কেশরওয়ালা মর্দা সিংহটার দিকে। তাক করলাম ঠিক হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে। ট্রিগার টিপতে যাব, এমন সময় ডান চোখে এসে পড়ল পোড়া নলখাগড়ার খানিকটা ছাই। গেলাম অন্ধ হয়ে। নাচতে শুরু করলাম জ্বলুনিতে, চোখ ডলতে শুরু করলাম। তারই ফাঁকে এক পলকের জন্য দেখলাম, খাদের মুখের ঝোপগুলো পেরিয়ে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হলো শেষ সিংহটা।

'রাগে উন্মাদ হয়ে গেলাম। ফাঁকা জায়গায় দুর্দান্ত সুযোগ পেয়েছিলাম সিংহগুলোকে খতম করে দেবার, ভাগ্যের অসহযোগিতায় করতে পারলাম না কিছুই। তবে তাতে দমে যাবার লোক নই আমি, ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেলাম খাদের দিকে। টম কাতর অনুরোধ করল, ওভাবে যেন সিংহের মুখোমুখি না হই, কিন্তু শুনলাম না। রোখ চেপে গেল, হয় আমি সিংহগুলোকে মারব, নয়তো ওরা মারুক আমাকে। টমকে বললাম, ইচ্ছে না থাকলে আমার সঙ্গে আসবার কোনও দরকার নেই ওর। এ-কথা শুনে কাঁধ ঝাঁকাল টম, বিড়বিড় করে বলল, আমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছি, অথবা কালো জাদু করা হয়েছে আমাকে। তবে মুখে যা-ই বলুক, একরোখার মতো পিছু পিছু এলো টম।

'শীঘ্রি খাদের কাছে চলে গেলাম দু'জন। দৈর্ঘ্যে ওটা তিনশো গজের কাছাকাছি হবে, এখানে ওখানে জন্মেছে বড় বড় গাছ। এবার শুরু হলো আসল খেলা। যে-কোনও ঝোপের আড়ালে থাকতে পারে সিংহ। চারটে সিংহ খাদে আছে তাতে সন্দেহ নেই কোনও, প্রশ্ন হচ্ছে–আছে কোথায়? চারপাশে সতর্ক চোখ রাখলাম, ভয়ে মনে হলো হৃৎপিণ্ডটা উঠে এসেছে কণ্ঠা পার হয়ে।

অবশেষে একটু পরে একটা ঝোপের পিছনে হলদে কী যেন নড়তে দেখলাম। ঠিক তখনই আমার সামনের ঝোপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে ডোবার দিকে ছুট দিল একটা সিংহ শাবক। ঘুরেই গুলি করলাম ওটাকে লক্ষ্য করে। লেজের দু'ইঞ্চি সামনে মেরুদণ্ডে লাগল বুলেট। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল সিংহ শাবক, নড়তে পারল না আর। তবে চোখ গরম করে চেয়ে থাকল। পরে ওটাকে বর্শা দিয়ে মেরেছিল টম। বন্দুকের ব্রিচ খুলে তাড়াহুড়ো করে ব্যবহৃত গুলির খোসা ফেলে নতুন গুলি ভরতে চাইলাম, কিন্তু খোসা বের করতে গিয়ে টের পেলাম, ফেটে গিয়ে ব্যারেলের গায়ে আটকে গেছে ওটার কিছু অংশ। নতুন গুলিটার মাত্র অর্ধেকটা ঢুকল চেম্বারে। আর ঠিক তখনই বাচ্চার কাতর ডাকাডাকিতে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলো সিংহী। আমার কাছ থেকে বিশ ফুট দূরে ওটা, লেজ নাড়তে নাড়তে আসছে। মনে হলো ওরকম নীচ চেহারার সিংহী আর দেখিনি। পিছু হটতে শুরু করলাম, সেইসঙ্গে চেষ্টা করছি নতুন গুলিটা চেম্বারে ভরতে। ছোট ছোট পায়ে সামনে বাড়ল সিংহী, কয়েক পা এগিয়ে বসে পড়বার ভঙ্গি করল। হামলা করে বসবে যে-কোনও সময়। এদিকে গুলিটা কিছুতেই ঢোকাতে পারছি না চেম্বারে। হঠাৎ মনে পড়ল গুলি প্রস্তুতকারকের নাম। নামটা বলব না। মনে হলো, আমি যদি সিংহীর কবলে পড়ে মরি, তা হলে ওই ব্যাটাও যেন একইরকম শাস্তি পায়। নতুন কার্ট্রিজ ঢুকছে না চেম্বারে, কাজেই এবার ওটাকে বের করতে চেষ্টা করলাম। কার্ট্রিজটা বের হলে বন্দুকটা বন্ধ করব। দ্বিতীয় নল ব্যবহার করতে পারব তা হলে। ব্যারেল ভাঙা অবস্থায় বন্দুক থাকা না থাকা সমান কথা।

'এসব ভাবতে ভাবতে পিছাচ্ছি, চোখ সরালাম না সিংহীর উপর থেকে। মাটিতে পেট ঘষটে লেজ নাড়তে নাড়তে চুপচাপ এগিয়ে আসছে ওটা, একবারও চোখ সরাল না আমার দিক থেকে। সিংহীর চোখ দেখে বুঝে ফেললাম, আর কয়েক সেকেন্ড সময় পাব, তারপর তেড়ে আসবে ওটা। গুলিটা নল থেকে টেনে বের করতে গিয়ে পিতলের ঘষায় কব্জি আর হাত থেকে রক্ত বের হয়ে গেল। এই যে দেখুন, এখনও রয়েছে ওই কাটাদাগ।'

হাতটা আলোয় ধরে কব্জির কাছে বেশ কয়েকটা সাদা রঙের গভীর কাটাদাগ দেখালেন মিস্টার কোয়াটারমেইন।

'কোনও লাভ হলো না, বের হলো না গুলিটা,' আবার বলতে শুরু করলেন তিনি। 'প্রার্থনা করি, যেন কোনও মানুষকে ওরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয় আর। আক্রমণের মানসিক প্রস্তুতি নেয়া হয়ে গেল সিংহীর। বাঁচবার আশা ছেড়ে দিলাম। আমার পিছনে কোথা থেকে যেন হঠাৎ চিৎকার করে উঠল টম, "আপনি কিন্তু আহত বাচ্চাটার গায়ে উঠে পড়বেন! ডানদিকে সরুন, কূস!"

'ওই ভীতিকর অবস্থাতেও কথাটা শুনে ডানদিকে সরে পিছাতে ভুল করলাম না। চোখ সরালাম না সিংহীর দিক থেকে।

'স্বস্তির বিরাট শ্বাস ফেললাম, যখন নিচু একটা গর্জন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে খাদের আরও গভীরে চলে গেল সিংহী।

'"আসুন, মাকুমাযান," ডাকল টম, "ওয়্যাগনে ফিরে যাই চলুন।"

"'যাব, আগে সিংহগুলোকে শেষ করে নিই," জবাব দিলাম। সিংহীর মুখোমুখি হয়ে এতো মানসিক কষ্ট পেয়েছি যে শপথ করে ফেলেছিলাম, সবক'টা শয়তানের শেষ দেখে ছাড়ব। "ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারো তুমি, বা গাছে উঠে বসতে পারো।"

'পরিস্থিতিটা চিন্তা করে দেখল টম, তারপর বুদ্ধিমানের মতো চড়ে বসল একটা গাছে। ওই একই কাজ করলে ভাল করতাম আমিও।

'এরমধ্যে ছুরিটা বের করে ফেলেছি। ওটাতে গুলির খোসা বের করবার একটা ফলা আছে। কিছুক্ষণ খোঁচাখুঁচির পর ফেটে যাওয়া কার্ট্রিজটার টুকরো বের করতে পারলাম। পুরুত্বের দিক থেকে বড়জোর একটা স্ট্যাম্পের সমান হবে ওটা, লেখার কাগজের চেয়ে পাতলা। কাজটা সেরে বন্দুক লোড করে হাতের ক্ষতগুলোতে রুমাল বাঁধলাম, তারপর এগোলাম আবার।

'খেয়াল করেছি, সবুজ একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে সিংহী। জায়গাটাকে কয়েকটা ঝোপের একটা ঝাড়ও বলা যায়। খাদের ওখানে আমার থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে বয়ে যাচ্ছে ছোট একটা ঝর্না, ওই পানির কিনারায় জন্মেছে ঝোপগুলো। সাবধানে পৌঁছে গেলাম ওগুলোর কাছে, সিংহের কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না। বড় একটা পাথর ছুঁড়ে দিলাম ঝোপ লক্ষ্য করে। মনে হয় অন্য সিংহ শাবকটার গায়ে গিয়ে লাগল ওটা, কারণ ছুটতে ছুটতে শাবকটাকে বের হতে দেখলাম। পাশ থেকে গুলি করলাম ওটাকে। সরাসরি বুকে ঢুকল বুলেট। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল ওটা। শাবকের পিছু নিয়ে ঝোপ থেকে ছিটকে বের হলো সিংহী, বিদ্যুদ্বেগে ছুটল খাদের মুখের দিকে। বন্দুকের দ্বিতীয় ব্যারেল খালি করলাম তাড়াতাড়ি। সিংহীর পাঁজরে লাগল বুলেট। গুলি খাওয়া খরগোশের মতো কয়েকবার গড়াল সিংহী। দেরি না করে আরও দুটো গুলি ভরলাম বন্দুকে। ততক্ষণে আঘাতটা সামলে নিয়ে গর্জন আর গোঙানি ছেড়ে পেট ঘষটে আমার দিকে আসতে শুরু করেছে সিংহী। ওটার চেহারায় যেরকম রাগ দেখলাম, ওরকম আগে কখনও দেখিনি বুনো জানোয়ারের চেহারায়। এবার ওটার বুকে গুলি করলাম। কাত হয়ে পড়ে গেল মৃত সিংহী।

'ওই প্রথম এবং শেষবারের মতো কোনও সিংহ পরিবারকে শিকার করেছিলাম আমি। আগে কেউ কখনও একা এরকম ঝুঁকি নিয়ে একাধিক সিংহ শিকার করেছে বলে শুনিনি। স্বাভাবিক ভাবেই নিজের উপর খুশি হয়ে উঠেছিলাম। বন্দুকটা আবার লোড করে নিয়ে খুঁজতে শুরু করলাম ক্যাপ্টেনের খুনি কালো কেশরওয়ালা সিংহটাকে। খুব ধীরে, সাবধানে খাদ ধরে এগোলাম। ভীষণ উত্তেজনায় কাটতে লাগল সময়। জানি না কখন ওটা কোত্থেকে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। স্বস্তি পেতে চাইলাম এ-কথা ভেবে যে, সাধারণত কোণঠাসা হয়ে না পড়লে কোনও মানুষকে আক্রমণ করে না সিংহ। এক ঘণ্টার বেশিই হবে, খুঁজলাম সিংহটাকে। একবার মনে হলো ট্যাম্বাউকি ঘাসের মধ্যে কী যেন নড়তে দেখেছি, তবে নিশ্চিত হতে পারলাম না। ওদিকে গিয়ে দেখা পেলাম না সিংহটার।

'শেষপর্যন্ত খাদের শেষমাথায় পৌঁছে গেলাম। জায়গাটা কানাগলির মতো।

খাদ শেষ হয়েছে পঞ্চাশ ফুট উঁচু খাড়া পাথরের দেয়ালের গায়ে। দেয়ালের মাথা থেকে গড়িয়ে পড়ছে ক্ষীণকায়া একটা ঝর্নাধারা। খাড়া দেয়ালের কাছ থেকে সত্তর ফুট দূরে স্তূপ হয়ে পড়ে আছে অনেকগুলো পাথরখণ্ড। ওগুলোর উপর জন্মেছে ফার্ন আর বেঁটে কিছু ঝোপ। স্তূপটা উচ্চতায় পঁচিশ ফুটমত হবে। ওখানে দু'পাশের খাদের দেয়ালও খুব খাড়া। স্তূপে উঠে সিংহটার খোঁজে চারপাশে তাকালাম। কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না রাজকীয় জানোয়ারটার। হয় খাদের ভিতর না দেখে সিংহটাকে পাশ কাটিয়েছি, অথবা কোনওভাবে পালিয়ে গেছে ওটা। যা-ই হোক, নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম, তিনটে সিংহ শিকার করতে পারা কম নয়। চিন্তাটা বেশ তৃপ্তিই দিল আমাকে। নেমে পড়লাম স্তূপ থেকে, তারপর ফিরতি পথ ধরলাম স্তূপটাকে পাশ কাটিয়ে। এতক্ষণে অনুভব করলাম, শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনা ও পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কাজ পড়ে আছে এখনও, সিংহ তিনটের চামড়া ছাড়াতে হবে। যতদূর মনে পড়ে, স্তূপটা পিছনে ফেলে আঠারো গজমত গিয়ে আরেকবার ফিরে তাকালাম। যথেষ্ট তীক্ষ্ণ আমার চোখ, কিন্তু চোখে পড়ল না কিছু।

'তারপর, হঠাৎ করেই সতর্ক হয়ে উঠলাম। স্তূপের উপর পাথুরে দেয়ালের পটভূমিতে দেখতে পেলাম কালো কেশরওয়ালা প্রকাণ্ড সিংহটাকে। গুটিসুটি মেরে ছিল ওটা, এবার উঠে দাঁড়াল। গুলি করবার সুযোগ পেলাম না, কাঁধেও তুলতে পারলাম না বন্দুক, বারকয়েক লেজ নেড়ে স্প্রিঙের মতো ছিটকে লাফ দিল ওটা সরাসরি আমাকে লক্ষ্য করে। বাতাসে তীরের মতো ভেসে এলো ভারী শরীরটা।

'ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না কীরকম রাজকীয় লাগছিল ওটাকে দেখতে। বোঝাতে পারব না দৃশ্যটা কতখানি ভীতিকর। ধনুকের মতো বাঁকা রেখা সৃষ্টি করে উড়ে এলো কালো কেশরওয়ালা সিংহ। ওটা ধনুকের মাঝামাঝি এলো, আমিও গুলি করলাম। লক্ষ্যস্থির করবার সময় ছিল না, স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম ঠিক আমার উপরে এসে পড়বে সিংহটা। আবছাভাবে বুলেট আঘাত হানবার ভোঁতা আওয়াজটা শুনতে পেলাম, পরমুহূর্তে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম লতায় ছাওয়া একটা নরম ঝোপের উপর। আমার উপর চড়ে বসল সিংহটা, বসেই বড়বড় দাঁতগুলো বসিয়ে দিল উরুর মাংসে। হাড়ের সঙ্গে দাঁতের সংঘর্ষের কর্কশ আওয়াজ শুনতে পেলাম। ধরে নিলাম মারা যাচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ উরু থেকে কামড় ছেড়ে দিল শ্বাপদ, আমার উপর দাঁড়িয়ে সামনে-পিছনে দুলতে শুরু করল। বিরাট মুখটা হাঁ করতেই গলগল করে রক্ত পড়তে দেখলাম। বিকট গর্জন ছাড়ল সিংহ। পাথরগুলো কাঁপল থরথর করে।

'মনে হলো অনন্তকাল ধরে সামনে-পিছনে দুলছে ওটা, তারপর বিরাট মাথাটা ধপ করে পড়ল আমার উপর। ভারী মাথা বুকে এসে পড়ায় বাতাস বেরিয়ে গেল আমার ফুসফুস থেকে। উরুর ব্যথায় জ্ঞান হারানোর অবস্থা। দম ফিরে পেয়ে টেনেহিঁচড়ে নিজেকে বের করে আনলাম মৃত সিংহের তলা থেকে। দেখলাম, ঠিক বুকের মাঝখানে গুলি খেয়েছে সিংহ, শরীরের গভীরে গিয়ে ঢুকেছে বুলেট। কপাল ভাল, সিংহের কামড়ে উরুর হাড় ভাঙেনি আমার।

তবে দরদর করে রক্ত পড়ছিল। রক্তক্ষরণে মারাই যেতাম, যদি না ঠিক সময় হাজির হতো টম। ওর সাহায্য নিয়ে রুমাল দিয়ে শক্ত করে বাঁধলাম কামড়ের ক্ষত।

'পুরো একটা সিংহ পরিবারকে একা শিকার করতে চাওয়ার মতো বোকামি করায় ওই ক্ষতটা আমার প্রাপ্য হয়েছিল। ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলাম অনেক বেশি। ওই ঘটনার পর থেকে খোঁড়া হয়ে গিয়েছি। মরবও এই খোঁড়ামি নিয়েই। প্রতিবছর মার্চ মাসে আহত উরু ভীষণ কষ্ট দেয়, তিনবছর পরপর চামড়া-মাংস ফেটে নতুন করে দগদগে হয়ে ওঠে ক্ষতটা।

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, বাপেডিদের আনা হাতির দাঁতগুলো শেষপর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারিনি আমি? আরেক লোক ওগুলো কিনে নেয়। পাঁচশো পাউন্ড লাভ করেছিল জার্মান লোকটা। পরবর্তী মাসটা বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল আমাকে। ছ'মাস স্রেফ পঙ্গু ছিলাম। আর কিছু বলবার নেই আমার। কী ঘটেছিল সেটা আপনারা এখন জানেন।'

নির্বাক আমাদের শুভরাত্রি জানিয়ে সামান্য খুঁড়িয়ে হেঁটে শোবার ঘরে চলে গেলেন মিস্টার কোয়াটারমেইন।

***

অনুবাদ

আ টেল অভ থ্রি লায়ন্স

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড/কাজী মায়মুর হোসেন

দুর্ধর্ষ শিকারী অ্যালান কোয়াটারমেইনের
তিনটি রোমহর্ষক কাহিনির সঙ্কলন
এ-বই। এতে রয়েছে হান্টার কোয়াটারমেইন,
আ টেল অভ থ্রি লায়ন্স ও লং অডস।
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের অন্যান্য কাহিনির
মত এগুলোও আপনার ভালো লাগবে
নিঃসন্দেহে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম : ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০